আয়ুধ

অনলাইন পত্রিকা ২০২১

সংখ্যা ২

শতায়ু সত্যজিৎ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়

আয়ুধ

অনলাইন পত্রিকা

সূচি

অনুভবে সত্যজিৎ

মননে সত্যজিৎ
অভি দাস

সত্যজিৎ শতবর্ষ
বাকিবুল্লা মন্ডল

ফিরে এসো সত্য
সুস্মিতা দাস

সত্যজিৎর প্রতি
রমেন পাত্র

আমার সত্যজিৎ রায়
সাগরিকা রায়

মহারাজা সত্যজিত রায়
সমতা ভৌমিক

রেখায় সত্যজিৎ

সমতা ভৌমিক

প্রিয়া মজুমদার

ঊর্মি চৌধুরি

মৌ ঘোষ

দিশা দাস

সুমাইয়া পারভিন

সুস্মিতা দাস

ভাবনায় সত্যজিৎ

উৎকল্পনার সত্যজিৎ
পারমিতা সাহা

সঙ্গীত ভাবনা: সত্যজিৎ রায়
প্রণয় সর্বজ্ঞ

সত্যজিতের সুপ্ত ভক্তি
কৌস্তুভ কুমার ঘোষ

চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায়
মৌমি সাহা

ছোটোগল্পকার সত্যজিৎ
শুভজিৎ দাস

সত্যজিতের সর্বজয়া
দীপা পাল

সত্যজিতের শঙ্কু: রহস্য উন্মোচন ও ব্যর্থতা
সুশান্ত পাত্র

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত তিন কন্যা সিনেমার নারী চরিত্র
নাফিসা খাতুন

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বারাসাত সরকারি কলেজ

আয়ুধ

২০২১

সম্পাদকীয়

প্রত্যেক বছর বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয় এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে আয়ুধ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত করি। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কাছে খুবই দুর্বিষহ। তবুও যে আমরা আমাদের ক্রিয়া-কলাপ থেকে সরে এসেছি এমন নয় আমরা আমাদের কাজে অবহেলা করিনি আশা করি করবো না। এই পরিস্থিতি তাকে প্রতিহত করে আমরা অনলাইনের মাধ্যমে এই পত্রিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা গৃহবন্দি হয়ে গেছি এবং এই গৃহবন্দি দশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম চিন্তা ভাবনা করতে উদ্যোগী হয়েছি। তেমনি একটা চিন্তা ও ভাবনার মানুষ হলেন সত্যজিৎ রায়। তাঁকে নিয়েই আমাদের এই বারের পত্রিকা। ছাত্র-ছাত্রীরা ও বিভাগ সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাঁকে নিয়ে একটি অনলাইন সংখ্যা তৈরি করার।

সত্যজিৎ রায়ের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে এবছর তাঁকে নিয়েই আমাদের পত্রিকা তৈরি হয়েছে। এই পত্রিকার মধ্যে আমরা পেয়েছি বিভিন্ন রকমের আঁকা, প্রবন্ধ, কবিতা প্রমুখ। সহায়তা পেয়েছি বিভাগ তথা ছাত্র-ছাত্রীদের। আমরা জানি এই কাজটি করতে আমাদের অনেক ভুল-ত্রুটি হয়েছে। তবুও সেই ভুলত্রুটি কে মার্জনা করে আমাদের পাশে থাকবেন ,আমাদের সাথে থাকবেন, মনে থাকবেন এবং মননে থাকবে।

অভি দাস ও সমতা ভৌমিক (যুগ্ম সম্পাদক)
বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

অনলাইন পত্রিকা

মননে সত্যজিৎ

অভি দাস

হারকে করে পদানত, জয়কে করলে উজ্জীবিত
তুমি সত্যজিৎ, আপনার হৃদে বাঙালিয়ানা নাহি হলো অবসান
জন্ম আপনার কলকাতাতে, কলকাতারই গর্ব
আপনার প্রতিভাকে আজ অবধি কেউ করেনি খর্ব।
সাহিত্যিক বনাম চলচ্চিত্রায়ক কিংবা অভিনয় নির্দেশক
হাতে করে দেখালেন একের পর এক মহৎ সৃষ্টি এই বিশ্বময়।
বিভূতি বাবুর সঙ্গে দেখালেন এক নিবিড় বন্ধন
চলচ্চিত্র জগতে ঘটালেন তার প্রতিফলন।
করেছেন অনেক ছবি পথের পাঁচালি থেকে অপু ট্রিলজি
কিংবা অশনি সংকেত বা অপরাজিত, পরশপাথর।
রবীন্দ্রনাথের সাথেও ঘটালে আত্মীকরণ
তাহার ফলশ্রুতি হলো তিনকন্যা, চারুলতা নয়তো বা ঘরে বাইরে।
বাংলার পাশাপাশি হিন্দিতেও আভিজাত্য আপনার
কেন জানি মনে হয় জ্বল-জ্বল করছে আপনার উপস্থিতি হৃদয়ময়।
একটা সিগারেট মুখে নিয়ে ভাবতেন নিশ্চয়
আপনার অবর্তমানে চলচ্চিত্রে আসবে আরও গতি নিশ্চয়
রক্তে যার লেখা জমা, মুছতে কি পারে কেউ ?
ছাপ রেখেছেন অঙ্গে নামের নামী করেছেন বঙ্গে তথা বিশ্বে ।
কেঁদেছেন, কাঁদিয়েছেন, হেসেছেন, হাসিয়েছেন
সৃষ্টি করেছেন নতুনত্ব, ঘটিয়েছেন চমকত্ব।
জানি সত্যজিৎ হলেই সত্যজিৎ নয়সত্যজিৎ রায় একবারই হয়।

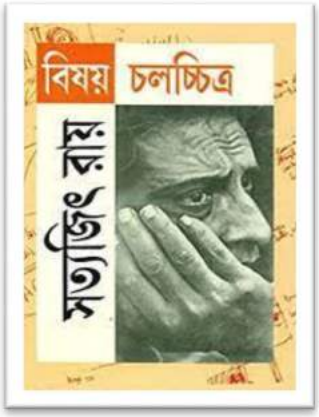

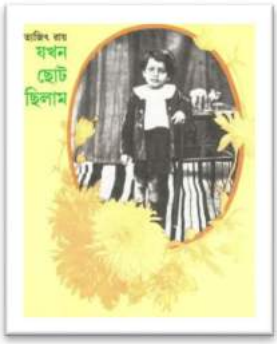

সত্যজিৎ শতবর্ষ

বাকিবুল্লা মন্ডল

শিল্পের গোধূলি সাঁঝে
বাঙালির সৃষ্টিবেলা,
সুখ্যাতির রায়বংশে
কত প্রতিভার মেলা।
স্মৃতির খাঁজে উপেন্দ্র
সুকুমার ওই গন্ধে,
সত্যজিৎ আছেন হৃদয়কোঠায়,
আছেন আপন মহিমায় ছন্দে।
যে হাতে ওঠে কলম
জাগে কত আঁকা-লেখা,
অলঙ্কারন ও সম্পাদনা
তার তুল্য যায় না দেখা।
এ কুঁড়িতে অঙ্কন ফোটে
সত্যের কলম ছোটে,
সেখানে কি ডোবে সূর্য
শত বৎসরে মোটে।
এ বিশ্ব দরবারে তাঁর
ফিল্মে জয়জয়কার।
'পথের পাঁচালী' হোক
কিংবা 'অপুর সংসার'।
এসবের হাত ধরে
পেয়েছে ভালোবাসা,
কুড়িয়েছে সম্মান।
এমন শত বছর আরো যাবে
তবু তিনি থাকবেন চির অম্লান।

ফিরে এসো সত্যজিৎ

সুস্মিতা দাস

ছায়ার আলোতে দেখেছিলাম এক মুখ
প্রবীণেরা শুনিয়েছিলেন এক নাম।
ছুটেছিলাম স্পর্শ করতে হাজারতর সৃষ্টি
কিছুটা পেয়েছি, কিছুটা পারিনি বুঝতে
ভেবেছিলাম আবারও পড়তে বসবো, দেখতে বসবো,
আঁকতে বসবো, ভাবতে বসবো।
সবটা ভাবা হয়নি, বোঝা হয়নি;
বাকি রয়ে গেছে অনেক কিছু
ক্যামেরা বন্দী করেছে কতো আলো কতো প্রতিকৃতি
লুকোচুরি খেলেছে কতো ছাপ শত সিনেমার রীলে।

শোনা গেছিল সেই সময় এক যুবকের নাম
রুপোলী সুরে ভেসেছিল তার স্বপ্ন নানা চিত্রপটে।
ধরেছিল রূপ, বেঁধেছিল রাগ, ভরেছিল রং
উঠে এসেছিল নানা মুখ নানা কথা;
ছায়াছবি চিনেছিল স্রষ্টাকে।
এখনও অনেক কিছু বাকি রয়ে গেছে
ফাঁকি হয়েছে অনেক, হয়েছে অনেক ছুটি কাটানো;
ফিরে এসো সত্যজিৎ।

সত্যজিৎর প্রতি

রমেন পাত্র

সত্যজিৎ রায় তোমাকে প্রণাম
বাংলা সাহিত্যে তোমার রয়েছে বহু অবদান
কখনও শঙ্কু কখনও ফেলুদা কখনও তারিনী খুড়ো
বাংলা কিশোর সাহিত্য তোমায় ছাড়া অপূর্ণ
শঙ্কুর বিজ্ঞানীপনা আমাদের করে অবাক
ফেলুদার বুদ্ধিদীপ্ততায় তোপসেও হয় হতবাক
তারিনী খুড়োয় পেয়েছি ভারতবর্ষের অ্যাডভেঞ্চার
সত্যিই মনকে করে একাকর
তোমার গোলাপের নতুন স্বাদে
হয় মন ধন্য
বাংলা চলচ্চিত্রেও তুমি নয় নগণ্য
গুপীগাইন বাঘা বাইন আজও মানুষের মনে জীবন্ত
পথের পাঁচালীর জন্য তুমি পেয়েছ অস্কার
বাংলা ছায়াছবি কেমন হতো তা তোমার কাছে বুঝে নেওয়া দরকার
সন্দেশ এর পত্রিকা ধরে তোমার জীবন শুরু
বাংলা চলচ্চিত্রে তুমি আজও সবার গুরু
কখনও কিশোর সাহিত্য কখনও চলচ্চিত্রে কখনও আঁকায়
তোমায় পিছুটান কে দেখায়
আজও বাঙালীর মনে তুমি জীবন্‌ত
সত্যজিৎ রায় তোমাকে পেয়ে বাঙালী ধন্য।

আমার সত্যজিৎ রায়

সাগরিকা রায়

প্রফেসর শংকু, ফেলুদা এবং তারিণীখুড়ো। তিনটি চরিত্রের প্রত্যেকটি অনন্য হয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়। আমরা শিখেছি সত্যজিতের স্কুল থেকে। জব চার্ণক নয়,সত্যজিৎ শেখালেন জব হলো চাকরি। আর নাম হলে জব নয়,জোব। এভাবে ছোট ছোট অনেক কিছু শিখলাম। এই বিখ্যাত তিনটি চরিত্রের একটিও অবান্তর নয়। আজও ধীরে ধীরে রস নিয়ে নিয়ে পড়ি প্রফেসর শংকু,তারিণী খুড়ো, ফেলুদার গল্প। সত্যজিতের লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয় প্রফেসর শংকুর কান্ডকারখানা নামক বই থেকে। সেখানে কম্পু নামে একটি রোবট 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানটি অবসর সময়ে গাইতো। ওর গলায় গানটি শোনাতো'ঘং ঘো ঘাং ঘো কুক্ক ঘং ঘা, আগাকেকেই ককুং ঘং ঘা'। তখন ক্লাস ফোর আমার। খুব বৃষ্টি পড়ছিল। ডুয়ার্সের কাঠের বাড়ির দোতলায় বসে এই গল্পটি পড়ে সত্যজিতের মায়ায় পড়ে গেলাম । আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বিশপ লেফ্রয় রোড আমার মনের তীর্থস্থান হয়ে উঠলো। এরপরে এলো ফেলুদা। তারপর খুড়ো। কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে তাঁর ছোট গল্প গুলো। এই গল্পগুলো সন্দেশ পত্রিকার পাতায় পড়েছি।কখনো ১২গল্পের ধারায় পড়েছি। সাধারণ মানুষ, নির্লিপ্ত ভংগীতে গল্প বলা, শেষে মোচড় এ সেতার বেজে ওঠা, এসবই সত্যজিতের বৈশিষ্ট্য। অজস্র গল্প যা কখনো পুরনো হবে না। পুরস্কার ,, বর্ণান্ধ, বংকুবাবুর বন্ধু, টেরোড্যাকটিলের ভ্রিম, সদানন্দের খুদে জগৎ... ., এক অসম্ভব নির্মল ভাবনায় আবিষ্ট করে রাখে। এই আকর্ষণ মিথ্যে নয়।চিরন্তন ।

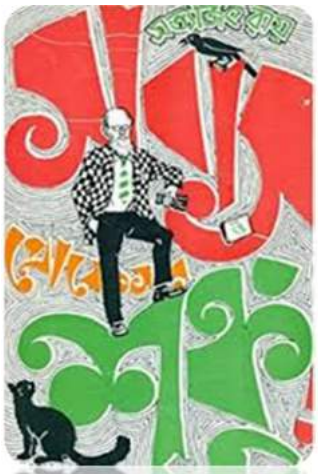

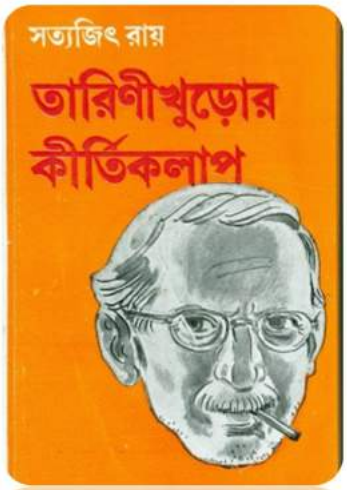

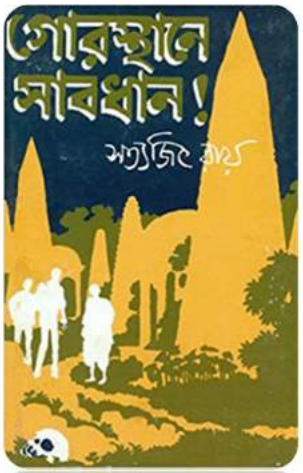

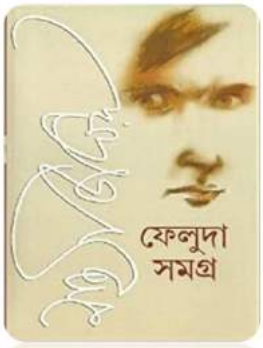

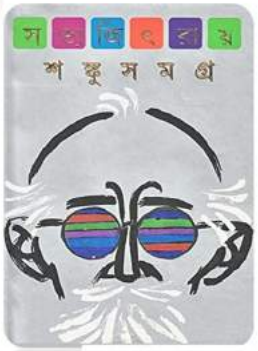

মহারাজা সত্যজিত রায়

সমতা ভৌমিক

'কে'; 'কী করেছেন'; 'কীভাবে করেছেন' এইসব সংকোচ বোধ কে দুরে রেখে নির্দ্বিধায় গুনের খ্যাতিতে মানুষের অন্তরের অন্তরস্থলকে যিনি আবেগ প্রবণ করেছেন আজ সেই নক্ষত্রের উজ্জ্বলতম দিন।

তিনি বাঙালি কে শিখিয়েছেন *ফেলুদা*-র ধাঁচে কীভাবে বাক্স রহস্য ভেদ করতে হয়। কখনো দেখিয়েছেন *লালমোহন* হয়ে যায় *জটায়ু* , আবার কখনো ছোট্ট *তোপসে* চলে যায় *বাদশাহী আংটির* খোঁজে।

কখনো আমাদের ছোট্ট মনে বাস্তব আর কল্পনার তালেগোলে তৈরী করেন প্রফেসর শঙ্কু, সেই বিজ্ঞানী আবিষ্কার করে ফেলেন এক আশ্চর্য ওষুধ *মিরাকিউরল*, প্রয়োজন *নিউটন*-এর জন্য তৈরী করেন *ফিশপিল*।

আবার হঠাৎ করে চলে যায় চিরকুমার অবিবাহিত *তাড়িনীখুড়ো* র কাছে , সে কখনো ঘোলপাল্টে হয়ে যায় গণৎকার আবার কখনো খেলোয়াড় কখনো চলে যায় এক্কেবারে টলিউডে , মাঝে-মধ্যে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে হয়ে যায় *মহারাজা*।

তারপর নিজের ইচ্ছানুযায়ী বাঙালীর দুরন্তপনা স্বপ্নের কারিগর হয়ে তিনি নাম লেখান চলচ্চিত্রে, তৈরী করেন *অপু দুর্গা*, কখনো চলে যান *সোনার কেল্লা*-তে, কখনো পাড়ি দেন *হীরক রাজার দেশে*, আরো কতো কী এই ধরুন *চারুলতা*, *গুপি গাইন বাঘা বাইন*, *জয় বাবা ফেলুনাথ* ... ।

হ্যাঁ একদম ঠিক ধরেছেন, এই নক্ষত্র বাঙালি গর্ব ইনি মহারাজা সত্যজিত রায়!!

রেখায় সত্যজিৎ

প্রিয়া মজুমদার

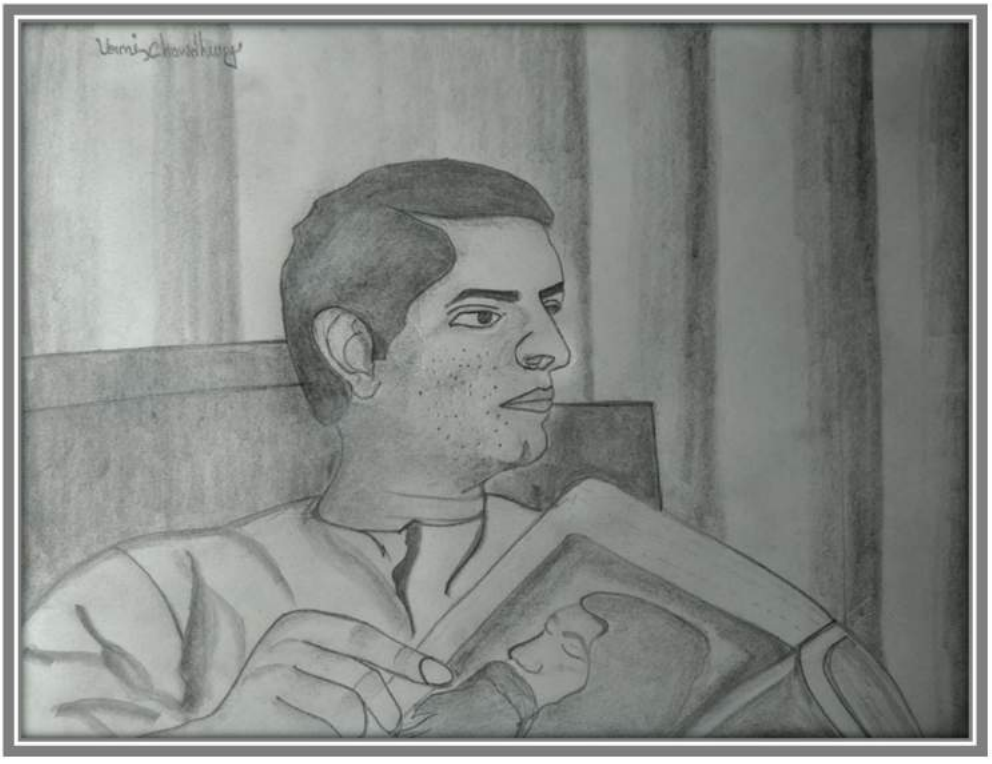

ঊর্মি চৌধুরি

রেখায় সত্যজিৎ

সুমাইয়া পারভিন

সুস্মিতা দাস

রেখায় সত্যজিৎ

মৌ ঘোষ

দিশা দাস

উৎকল্পনার সত্যজিৎ

পারমিতা সাহা

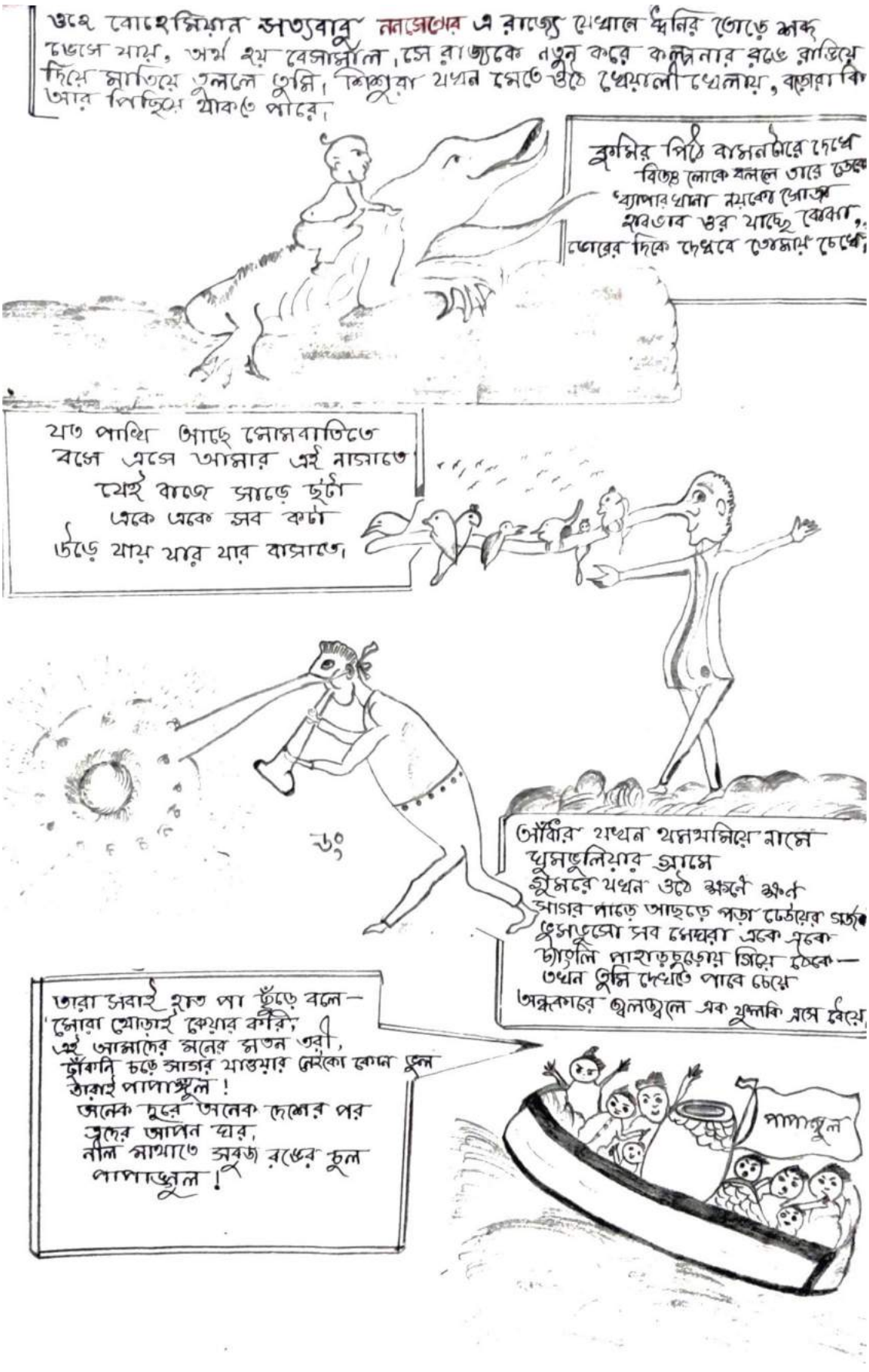

সঙ্গীত ভাবনা: সত্যজিৎ রায়

প্রণয় সর্বজ্ঞ

শিল্প এমন একটি শব্দ যার মধ্যে লুকিয়ে থাকে শিল্পীর অমোঘ জীবনবোধ। সাহিত্য, সিনেমা, সঙ্গীত, চিত্রকলার মধ্য দিয়ে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পৃথিবীতে খুব কম সংখ্যক মানুষ এসেছেন যারা শিল্পী শব্দটাকে ছাড়িয়ে গিয়ে হয়ে উঠেছেন 'creator' । সেই সেইরকমই এক অসামান্য সত্তা সত্যজিৎ রায়। কখনও তাঁর সুরের ঝংকার, কখনও ক্যামেরার দৃষ্টিভঙ্গি , কখনও আবার পরিচালকের কল্পনাশক্তি– সমস্ত কিছুতেই তার গভীর ভাবনা বাঙালি তথা বিশ্ববাসীর মন কেড়েছে বারবার। সুকিয়াস্ট্রীটের বাড়িতে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর হাত ধরে প্রথমে 'মুকুল' ও পরে 'সন্দেশ' পত্রিকায় সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে তার শিল্প জগতে পথ চলার শুরু, সেদিন কে ভেবেছিল জীবনের শেষ পর্বে এসে সেই ছোট্ট ছেলেটির হাতেই উঠবে চলচিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'অস্কার" ?

সত্যজিৎ রায়–কে আমরা বিশেষ ভাবে চিনি তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে। পরিনত বয়সে পরিচালক হিসাবে তাঁর খ্যাতি থাকলেও অনেকগুলি চোরা স্রোত বারবার আঘাত এনেছে তাঁর পরিচালক সত্তায়। এরমধ্যে অন্যতম সঙ্গীত। প্রথমে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের ভূমিকা যতটা কম হয় ততই ভালো। একেবারেই না হলে সবচেয়ে ভালো। পরবর্তীতে এই ভাবনা থেকে তিনি সরে এসেছিলেন, না হলে তাঁর চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া এই অবিস্মরণীয় সৃষ্টিগুলি থেকে বাংলার সঙ্গীতজগত থেকে বঞ্চিত থাকত। সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আকস্মিক নয়, ছেলেবেলার সুপ্ত বাসনা আর চলচ্চিত্রের প্রতি গবেষণা তাকে যেন শেষ পর্যন্ত

টেনে আনে সঙ্গীত পরিচালনার কাজে। ছেলেবেলায় তাঁর বাবার মৃত্যুর পর প্রফুল্লচন্দ্র মহালানবীশ প্রথম গ্রামোফোন কিনে দেন। সেই থেকে তাঁর গ্রামোফোন আর রেকর্ডের শখ। আবার কলকাতার রেডিও স্টেশন চালু হওয়ার পর তাঁর বুলাকাকাই (প্রফুল্লচন্দ্র মহালানবীশ) তাকে রেডিও উপহার দিয়েছিলেন। যাকে বলা হত ক্রিস্টাল সেট, কানে হেড ফোন লাগিয়ে শুনতে হত। বিশ দশকের বেঠোফোনের ভায়োলিন কনচার্টের একটা রেকর্ড তাঁর সঙ্গী ছিল। বারবার শুনতে শুনতে সেই রেকর্ডটি সম্পূর্ণ স্মৃতিতে ধরা ছিল। পরে অবশ্য তাঁর মা চার খন্ডে 'রোমান্স অব ফেমাস লাইভস' উপহার দেন আর বাড়িতে ছিল দশ খন্ডের বুক অফ নলেজ। এই সব বই আর রেকর্ড থেকেই ছোট্ট ছেলেটির সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ জেগেছিল। সেই সাথে উপেন্দ্রকিশোরের বেহালা বাজানো আর সুকুমার রায়ের গান রচনা; সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অনুরাগকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিল।

সত্যজিৎ রায় তাঁর জীবনের প্রথম দিকে ছবি আঁকা আর ছবি তোলার ক্ষেত্রে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা তিনি ভাবেননি তখনও। তাঁর বন্ধু ডক্টর ঘোষাল তাকে অনেকবার ছবি তৈরীর কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে বারবার ছবি করার অসুবিধা গুলোর কথাই নিয়েই তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। এক সময় সে সব অসুবিধার বেড়াজাল পেরিয়ে তিনি সৃষ্টি করলেন 'পথের পাঁচালি'। তখন সেই সিনেমার মিউজিকে করবেন এই নিয়ে বন্ধু বিলায়েত খাঁ সাহেবকে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিতে বলেন, সেইসময় তিনি সিনেমায় মিউজিক করতে নারাজ হওয়ায় সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব দেন রবিশঙ্করকে। তারপর জলসাঘর ছবিতে বিলায়েত খাঁ সুর দেন, কিন্তু যন্ত্র নির্বাচন থেকে শিল্পী এবং সঙ্গীত রচনা সমস্ত দায়িত্ব একা হাতে সামলেছেন সত্যজিৎ রায়। সুতরাং সঙ্গীতের প্রতি মোহ না থাকলে এত সহজভাবে দায়িত্ব সামলাতে পারতেন না তিনি।

তিনি এতটাই সাবলীল ছিলেন যে; যে কোনো জায়গায় বসে অনায়াসেই মিউজিক নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারতেন, এবং সেটি হত একেবারে নিখুঁত। তিনি এমন ভাবে মিউজিক তৈরী করতেন যে সেই মিউজিক আর পাঁচটা ছবির মতো নয়। একবার টোপা দা(অমর দত্ত – যন্ত্রী)র কাছে সত্যজিৎ রায়ের মিউজিক দক্ষতার কথা জানতে চাইলে তিনি জানান একবার ছবির আনকোরা মিউজিক তৈরীর সময় তিনি যন্ত্র বাজাতে ভুল করেছিলেন। তখন মানিকবাবু তাঁর নোটেশনটাই বদলে ফেলেছিলেন, তিনি জানান– " আমি মানিক বাবুর দিকে তাকালুম দেখলুম উনি নীচু হয়ে কাগজে কী লিখছেন। আমার একটু অবাক লাগল। দেখি স্কোরিংরুমে বসে নোটশন বা স্বরলিপি পাল্টাচ্ছেন, এমন ঘটনা আমি কখনো কোনোদিন দেখিনি।... মুহূর্তে আমি ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলাম"। অর্থাৎ ছেলেবেলা থেকে আগ্রহ আর সঙ্গীতকে কাটা–ছেঁড়া করবার দক্ষতা না থাকলে ব্যপারটা এতখানি সহজ হয়ত হয়ে যেত না।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি গুলিকে যদি আমরা পরপর সাজাই তবে দেখা যাবে, 'পথের পাঁচালী'(১৯৫৫), 'অপরাজিত'(১৯৫৬), 'পরশপাথর'(১৯৫৭), 'জলসাঘর'(১৯৫৮), 'অপুর(১৯৫৯), সংসার', 'দেবী'(১৯৬০) পর্যন্ত ছবিতে রবিশংকর, ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ, আলি আকবর খান সঙ্গীত পরিচালনা করলেও 'তিনকন্যা'(১৯৬১) থেকে 'মহানগর'(১৯৬৩), 'চারুলতা(১৯৬৪), 'গুপিগাইন বাঘাবাইন'(১৯৬৯), 'অশনি সংকেত'(১৯৭৩), 'সোনার কেল্লা'(১৯৭৪), 'জয়বাবা ফেলুনাথ'(১৯৭৯), কিংবা 'সদ্গতি'(১৯৮১)–র মতো মোট তিরিশটি ছবিতে তিনি সঙ্গীত পরিচালনা সামলেছেন সম্পূর্ণ নিজের হাতেই। বলা যায় প্রথম ছয়টি ছবি ছিল তার প্রশিক্ষণ পর্ব। তবে সেই ছবির সঙ্গীত নির্মাণে একেবারে যে তার নিজস্বতার নেই সেটা বলা অনুচিত হবে।

'তিনকন্যা'র টাইটেলেই তিনি তার স্বাক্ষর রাখলেন। 'সমাপ্তি'তে যখন মৃন্ময়ী নববধূ সাজে বাসর ছেড়ে রাতের অন্ধকারে বেড়িয়ে আসে তখন যে আবহ শুনতে পাই তা পাশ্চাত্য আঙ্গিকেই সৃষ্টি। কিন্তু রানার দেখে মৃন্ময়ী থমকে যায়। সেখানে তিনি কোনো সঙ্গীত ব্যবহার করেননি, রয়েছে শুধু রানারের ঝুম ঝুম ঘন্টার শব্দ। মাত্র একটি মাত্র যন্ত্রাংশ ব্যবহার করেই দৃশ্যের গভীরতর আবেদন ফুটিয়ে তুললেন। আবার যখন মৃন্ময়ী সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে দোলনায় দোল খায় তখন দৃশ্যের ডাইমেনশন বদলে দিয়ে দিয়ে দর্শকচিত্তকে একাত্ম করে দেন। এখানে আবার তিনি প্রাচ্য সুর ব্যবহার করলেন। ফলত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন এত নিখুঁত ভাবে ঘটান যে সেই সৃষ্টি তাকে স্রষ্টার পর্যায়ে নিয়ে যায়। আবার ধরা যাক 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিটি, সেখানে একটি দৃশ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘার কুয়াশা যখন ধীরে ধীরে কাটছে তখন একটি পাহাড়ী শিশু খোলা গলায় গান গাইছে। ক্রমে সেই সুরটাই নানান বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে পাহাড়ী ফোকটিউনে বদলে যায়। ফলে ছবিটির দৃশ্যের আবেদন কয়েকগুন বেড়ে যায়।

সত্যজিৎ রায়ের পরিনত আবহসঙ্গীত আমরা পাই 'চারুলতায়'। প্রেমের দ্বন্দ্ব, সুরিয়ালিজম, রোমান্টিকতা, সময় ও কালের কাব্যময়তাকে তিনি মিলিয়ে দেন সুরের বহমানতায়। দেখা যায় চারুর হাতে ভূপতির জন্য একটি রুমাল তৈরি হচ্ছে যে রুমাল শেষ পর্যন্ত ভূপতির চোখের জলে ভিজে ওঠে, দুজনের ভাঙা মনকে জোড়া দিতে পারল না। কিন্তু এই যে "মম চিত্তে নিনি নৃত্তে ..." এই কথার সাথেই জড়িয়ে থাকে নষ্টনীড়ের আসল বিষয়টা। এমন ভাবনা হয়ত ভারতীয় সিনেমাতে আগে কখনো হয়নি। আবার 'গুপী বাঘা' সিরিজের ছবিতে আমরা দেখেছি কীভাবে অবলীলায় মোৎজার্টের সিম্ফনির সুরে তিনি বেঁধেছেন একটা সহজ সরল লোকায়ত দেশতনার বাংলা গান। গানের ফাঁকে ফাঁকে যে অন্তর্বর্তী সঙ্গীত বেজে ওঠে সেখানে একই সাথে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তান এবং পাশ্চাত্য

সিম্ফনির চলনের মিশ্রণ। আবার কখনও বাংলা ঢোলের সাথে সেতার অবলীলায় মিলে যায়। 'ঘরে বাইরে' ছবিতে যখনই বিমলা অন্দরমহল থেকে বাইরে পা দেয় তখনই নেপথ্যে যে সঙ্গীত বেজে ওঠে তা একটি পরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরকে ভেঙে তৈরি করা অভূতপূর্ব অর্কেস্ট্রা। এই সুর যেন একইসাথে মুক্তি ও বেদনার ভাব বহন করে।

সঙ্গীত নিয়ে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা সবসময় চলত। তিনি মনে করতেন "রাগরাগিণীর শাস্ত্রীয় রূপ অবিকৃতভাবে ব্যবহার করার সুযোগ ছবিতে প্রায় নেই বললেই চলে। রাগরাগিণীর একটি নিজস্ব সত্তা আছে। কোনও ছবির পিছনে কোনও পরিচিত রাগ যদি প্রচলিত পন্থায়, বিস্তারিত হতে থাকে, তবে সে রাগসঙ্গীত শ্রোতার মনকে ছবি থেকে সঙ্গীতের মার্গে টেনে নিয়ে যেতে চাইবে"। ১৯৭৬ আনন্দবাজার পত্রিকায় 'অবসর' নামে এক প্রবন্ধে সত্যজিৎ জানিয়েছিলেন, তিনি তাঁর পরবর্তী সিনেমায় ঠুংরি সংযোজন করার কথা ভাবছেন। ১৯৭৭ সালে মুক্তি পায় শতরঞ্জ কে খিলাড়ী, ১৯৭৮–এ জয় বাবা ফেলুনাথ। দু'টি ছবিতেই সত্যজিতের ঠুংরি ব্যবহারের চিন্তা বাস্তব রূপ পায়। 'অবসরে' প্রবন্ধে সত্যজিৎ লিখেছিলেন, পুজোর ছুটিতে বসে মউজুদ্দিন খাঁ, কেশরবাঈ কেরকার, মুস্তরি বাঈ, জোহরাবাঈ আগ্রেওয়ালীর ঠুংরিই তিনি বার বার শুনছেন। সেই কারনেই 'জয় বাবা ফেলুনাথ'–এ আমরা কেশরবাঈ ও জোহরাবাঈ দু'জনের গানই পাই ।

'চিড়িয়াখানা'র একটি গানে তিনি শুধু সুর নয় কথাও লিখেছিলেন, গানটি ছিল "ভালোবাসার তুমি কী জান?" আবার হীরক রাজার দেশে তে "থাক... বাবা... বাবারে" কিংবা "পায়ে পড়ি বাঘ মামা" ইত্যাদি গান ধ্রুপদী সঙ্গীতের ছায়ায় থাকলেও তার মধ্যে নিজস্বতার ছাপ স্পষ্ট। "মহারাজা তোমারে সেলাম" গানটি লোকসঙ্গীতের আদলে তৈরি। আবার "কত সেনা চলেছে সমরে" গানটি পাশ্চাত্য ঘরানার হলেও তার প্রাচ্যকরণের ফলে তাকে বিদেশী ঘরানার বলে চেনবার উপায় আর নেই।

এখানেই সত্যজিতের সঙ্গীতভাবনা শ্রোতার মন জয় করে নেয়। সমস্তক্ষেত্রেই তার নিজস্ব বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে এক জটিল কিন্তু সাবলীল সঙ্গীতজগত তুলে ধরতে চেয়েছেন বারবার। গীতরচনা, ভাষার বুননকে তিনি চলচ্চিত্রে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে সেখানে পিতা সুকুমার রায়ের ঘরানার সহজ স্বচ্ছন্দ প্রবাহের উত্তোরাধিকারই যেন বহন করছে । এই সঙ্গীত ভাবনাই তাঁর চলচ্চিত্রকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছে।

সত্যজিতের সুপ্ত ভক্তি

কৌস্তভ কুমার ঘোষ

সত্যজিৎ রায়ের শতবর্ষ উপলক্ষে চলেছে হাজারো আলোচনা। কিন্তু বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিগত অনুভূতি গুলি তাঁর বৃহৎ কর্মের আড়ালে কোথায় যেন চাপা পড়ে যায়। সত্যজিৎ রায় নিজে জানাচ্ছেন, তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়ী। পরিভাষায় 'আগনস্টিক'।সিনেমায় ধর্মীয় লোকাচার নির্ভর সামাজিক সংস্কারের বিরোধিতা করে বৈজ্ঞানিক বস্তু নিষ্ঠতাকে তুলে ধরেছিলেন তিনি। কিন্তু কোথাও যেন একটা তবুও রয়ে যায়। জন্মসূত্রে সুকুমার পুত্র সত্যজিৎ ব্রাহ্ম। আশৈশব নিরীশ্বরবাদী আবহেই বেড়ে উঠে ছিলেন তিনি।এ হেন সত্যজিৎ রায়ের লেখা শ্যামা সঙ্গীতে কিন্তু ভক্তি রসের কোনো অভাব ছিল না।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনা অবলম্বনে ১৯৬০ সালে সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী' মুক্তি পাচ্ছে।
ছবিতে কালী মন্দিরের দাওয়ায় বসা এক ভক্তের লিপে শ্যামা সঙ্গীত টি ব্যবহার করেছিলেন সত্যজিৎ।ছবিটির

চিত্রনাট্যের তাগিদে একখানি শ্যামা সঙ্গীতের প্রয়োজন ছিল। সেখানে একখানি রামপ্রসাদী পদ ব্যবহার করলেও তো হতো যেমন টা করেছিলেন ফেলুদা সিরিজের 'শেয়াল দেবতা রহস্য' গল্পে ('বল মা তাঁরা দাঁড়াই কোথায়')। দিনের শেষে তিনি সত্যজিৎ। তাই নিজেই লিখে ফেললেন একখানি শ্যামা সঙ্গীত–

এবার তোরে চিনেছি মা।।
ও তোর নামে কালী মুখে কালী
অন্তরে তোর নাই কালিমা
নামে কালী মুখে কালী
অন্তরে তোর নাই কালিমা
এবার তোরে চিনেছি মা।।

যে বলে মা তুই পাষাণী,
তারেই আমি বেকুব মানি।।
আমি মনে জানি প্রাণে জানি
মনে জানি প্রাণে জানি
পাষাণের ওই কী মহিমা!
মনে জানি প্রাণে জানি
পাষাণের ওই কী মহিমা!
এবার তোরে চিনেছি মা।।
নূতন রূপে নূতন বেশে,
শ্যামা মায়ে দ্যাখো এসে।।।।

ও তার দয়ার পরশ
পেয়ে হরষ–দয়াময়ী গো
দয়ার পরশ
পেয়ে হরষ–দয়াময়ী গো
দয়ার পরশ পেয়ে হরষ
আনন্দেরই নাই কো সীমা।
এবার তোরে চিনেছি মা।।
নামে কালী মুখে কালী
অন্তরে তোর নাই কালিমা
ও তোর নামে কালী মুখে কালী
অন্তরে তোর নাই কালিমা
এবার তোরে চিনেছি মা।।

স্বভাবতই এই শ্যামা সঙ্গীতের আধ্যাত্মিক চেতনা-আত্মনিবেদনের কথা তা সত্যজিতের অন্যান্য সৃষ্টি করতে অধরা থেকে গিয়েছে। 'দেবী' ছবিটির সম্পূর্ণ সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন আলী আকবর। কিন্তু উক্ত শ্যামা সঙ্গীতটি তে সুরারোপ করেছেন সত্যজিৎ নিজে। গানটি গেয়েছেন পৃথ্বীশ মুখোপাধ্যায়। তিনিও কোনো পেশাদার গায়ক নন, ছিলেন কোলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্মকর্তা।তাকে খুঁজে বের করে গান রেকর্ড করানোটা ও ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বিবেকানন্দ গবেষক সাংবাদিক তরুণ গোস্বামী জানাচ্ছেন,'বারবার ঐ গানটি শুনলে সত্যজিৎ কোন স্তরের ভক্ত ছিলেন, কী গভীর তার আধ্যাত্মিক চেতনা তা টের পাওয়া যাবে।'সত্যজিৎ রায়ের রচিত একটি মাত্র শ্যামা সঙ্গীতের ব্যাখ্যা দিতে

গিয়ে এমনই মন্তব্য করেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন গোলপার্কের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ। স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দের কাছে নিত্য যাতায়াত ছিল সত্যজিৎ জননী সুপ্রভা দেবীর।

ব্রাহ্ম সংগীত চর্চার বহুলাংশে রেওয়াজ ছিল রায় বাড়িতে, তাই হয়তো শুধুমাত্র বাংলাদেশের প্রসাদী সুর নয়, পুরোদস্তর ব্রাহ্ম দর্শনও তার ভাবনা কে প্রভাবিত করে থাকবে।গানটি বহুমুখী সৃষ্টির সাথে সত্যজিতের সুপ্ত ভক্তির দলিলের দাবিদার।

উপসংহারে এও একবার মনে করিয়ে দিতে হয়, 'আগন্তুক' ছবিতে উৎপল দত্তের জবানিতে সত্যজিৎ নিজের গলায় গেয়েছেন 'হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ,যাদবায় নম'।

সত্যজিৎ রায়ের বেশ কিছু ছোট গল্পে উল্লেখ রয়েছে, দেয়ালে টাঙানো পরমহংসদেবের ছবির কথা। রায় সাহেব নিজে হয়তো খুব একটা ভক্ত মানুষ ছিলেন না, তবুও তিনি বাঙালির ঘরের দেয়ালের পরমহংসদেবের ছবির কথা তাঁর গল্পে তুলে আনতে ভোলেননি।

বর্তমানে পরমহংসদেবের দুটি ছবির একটি তাঁর নিজের হাতে আঁকা ও অন্য ছবিটি সত্যজিৎ রায়ের বাস ভবনে।।

তথ্যসূত্র- ১.সাম্প্রতিক কালের কিছু পত্র-পত্রিকা।
২.রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষণক সাংবাদিক তরুণ গোস্বামীর থেকে পাওয়া তথ্য।।

চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায়

মৌমি সাহা

চলচ্চিত্র জগতের চলচ্চিত্র নির্মাতা নক্ষত্র হলেন সত্যজিৎ রায়।চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে সত্যজিৎ ছিলেন বহুমুখী এবং তাঁর কাজের পরিমাণ বিপুল। সত্যজিৎ কর্মজীবন একজন বাণিজ্যিক চিত্রকর হিসেবে শুরু হলেও প্রথমে কলকাতায় ফরাসি চলচ্চিত্র নির্মাতা জঁ রনোয়ারের সাথে সাক্ষাৎ ও পরে লন্ডন শহরে সফররত অবস্থায় ইতালীয় নব্য বাস্তবতাবাদী চলচ্চিত্র লাদ্রি দি বিচিক্লেত্তে দেখার সত্যজিতের চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান ও বিশেষ উপাদান ছিল এর মানবতাবাদ। তার ছবিগুলো আপাতদৃষ্টিতে সরল, কিন্তু এই সরলতার গভীরে লুকিয়ে আছে জটিলতা। তার চলচ্চিত্রের বর্ণনাভঙ্গি ও চরিত্রায়ন নিখুঁত বলে অনেকবার প্রশংসিত হয়েছে। অনেকেই তার কাজের গভীর প্রশংসা করেছেন, এবং এর মধ্যে অন্যতম হল আকিরা কুরোসাওয়ার করা এই উক্তিটি: 'সত্যজিতের চলচ্চিত্র না দেখা আর পৃথিবীতে বাস করে চন্দ্র-সূর্য না দেখা একই কথা'। অন্যদিকে সত্যজিতের নিন্দুকেরা মনে করেন তাঁর ছবিগুলো অত্যন্ত ধীর গতির, যেন "রাজকীয় শামুকের" চলার মত।তারা সত্যজিতের মানবতাবাদকে ভাবেন সরলমনস্কতার বহিঃপ্রকাশ, আর তাঁর কাজকে মনে করেন আধুনিকতা-বিরোধী। তারা আরও বলেন যে সত্যজিতের চলচ্চিত্রে তাঁর সমসাময়িক পরিচালকদের মত নতুন অভিব্যক্তি কিংবা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখতে পাওয়া যায় না।

স্ট্যানলি কফম্যান লিখেছেন যে সত্যজিতের কিছু সমালোচক মনে করেন যে সত্যজিৎ "আগে থেকেই ধরে নিয়েছেন যে যেসব চলচ্চিত্র কেবল তাদের চরিত্রগুলোকে নিয়েই পড়ে থাকে।সত্যজিৎ নিজেই বলেছেন যে তাঁর চলচ্চিত্রগুলোর ধীরগতির ব্যাপারে তাঁর কিছুই করার নেই, এবং তারপর কুরোসাওয়া সত্যজিতের পক্ষ নিয়ে বলেন যে 'সত্যজিতের ছবিগুলো মোটেই ধীরগতির নয়। বরং এগুলোকে শান্তভাবে বহমান এক বিরাট নদীর সাথে তুলনা করা যায়।'

অনেক সমালোচক সত্যজিতের চরিত্র নির্মাণ নিয়ে অনেক প্রসঙ্গ তুলেছেন। আবার ভিন্ন দিকে অন্য সমালোচকরা সত্যজিৎ রায় কে শেক্সপিয়ারের সঙ্গে তুলনা করতে বাধ্য হন। তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের গৌরব। কেউ কেউ মনে করেন চরিত্রাভিনেতা দের থেকে শ্রেষ্ঠ নির্যাসটুকু বের করে নেওয়ার আগে পর্যন্ত কখনো 'প্যাক আপ' বলতেন না।

দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় সত্যজিতের ওপর লেখা শ্রদ্ধাঞ্জলিতে এই অনুভূতিই প্রকাশ পায় এভাবে: "Who else can compete?

সত্যজিৎ চিত্রনাট্য রচনাকে পরিচালনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করতেন। এ কারণেই কর্মজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন না।

২০০৪ সালে, বিবিসির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি তালিকায় সত্যজিৎ ১৩তম স্থান লাভ করেছিলেন।হৃদযন্ত্রের জটিলতার কারণে ১৯৯২ সালের ২৩ এপ্রিল বাংলা চলচ্চিত্র জগতের নক্ষত্রের পতন ঘটে; সত্যজিৎ মৃত্যুবরণ করেন।

ছোটোগল্পকার সত্যজিৎ

শুভজিৎ দাস

মহারাজা তোমারে সেলাম....!!!

জন্মবার্ষিকীতে বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী সত্যজিৎ রায়কে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

সত্যজিৎ রায় (২ মে ১৯২১–২৩ এপ্রিল ১৯৯২)যেমন ছিলেন এক ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক তেমনি বাংলা সাহিত্যেও তার অবদান অপরিসীম। তার হাতের সোনার কাঠির স্পর্শে বাংলা সাহিত্য বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেছে।

সত্যজিৎ রায় তাঁর সাহিত্য জীবনে তিনটি কালজয়ী চরিত্র সৃষ্টি করে গেছেন যা বাঙালির মননে চিরকালীন আসন লাভ করে আছে।সেই অমর তিনটি চরিত্র হলো 'ফেলুদা', 'প্রফেসর শঙ্কু' এবং 'তারিণী খুড়ো'। বালক থেকে বৃদ্ধ প্রত্যেকের কাছেই এই কালজয়ী তিনটি চরিত্র অত্যন্ত প্রিয়।এই তিনটি চরিত্র ছাড়াও তিনি অসংখ্য ছোট গল্প এবং উপন্যাস রচনা করেছেন।

প্রথমেই আসা যাক ফেলুদার প্রসঙ্গে , যার আসল নাম প্রদোষ চন্দ্র মিত্র। তিনি হলেন কলকাতাবাসী একজন গোয়েন্দা বা সত্যান্বেষী। তার দু'জন সঙ্গী হলেন তপসে (খুড়তুতো ভাই তপেশ রঞ্জন মিত্র) এবং লালমোহনবাবু (লালমোহন গাঙ্গুলী যিনি জটায়ু ছদ্মনামে রহস্য রোমাঞ্চকর গল্প লেখেন)।

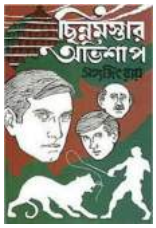

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সন্দেশ পত্রিকায় ফেলুদা সিরিজের প্রথম গল্প 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' প্রকাশিত হয়। ১৯৬৫–১৯৯৭ পর্যন্ত এই সিরিজের মোট ৩৫ টি সম্পূর্ণ ও চারটি অসম্পূর্ণ গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।

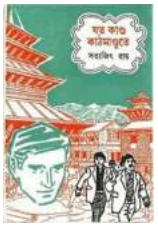

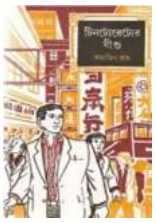

যেমন–'শেয়াল দেবতা রহস্য'(গল্প), 'যত কান্ড কাঠমান্ডুতে'(১৯৮১), 'বোসপুকুরে খুনখারাপি'(গল্প) 'কৈলাশে কেলেঙ্কারি' (১৯৭৪),'বাক্স রহস্য' (১৯৭৩) 'টিনটোরেটোর যীশু'(১৯৮৫), 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য'(১৯৭৫), 'বাদশাহী আংটি'(১৯৬৯), 'সোনার কেল্লা'(১৯৭২),'জয় বাবা ফেলুনাথ'(১৯৭৬) প্রভৃতি।

এরপর সত্যজিৎ সৃষ্ট অমর চরিত্রটি হল– প্রফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু ওরফে প্রফেসর শঙ্কু।তিনি তার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং প্রশংসনীয় জ্ঞানের দ্বারা নানান অসাধ্য সাধন করেছেন।তার জীবনে জড়িয়ে আছে একাধিক অ্যাডভেঞ্চার মূলক কর্মকান্ড।

প্রফেসর শঙ্কু সিরিজের অন্যতম গ্রন্থ গুলি হলঃ–

১)১৯৬৫ সালে নিউ স্ক্রীপ্ট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'প্রফেসর শঙ্কু'গ্রন্থ। যার মধ্যে ছিল 'প্রফেসর শঙ্কু ও ম্যাকাও', 'প্রফেসর শঙ্কু ও আশ্চর্য পুতুল',' প্রফেসর শঙ্কু ও গোলক রহস্য', 'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরী' ইত্যাদি গল্প। এরপর প্রফেসর শঙ্কু সিরিজের সমস্ত গ্রন্থই আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

২)১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয় 'প্রফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা' গ্রন্থ।এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্প গুলি হল 'প্রফেসর শঙ্কু ও গরিলা', 'প্রফেসর শঙ্কু ও বাগদাদের বাক্স', 'প্রফেসর শঙ্কু ও রক্তমৎস্য রহস্য' ইত্যাদি।

৩)১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয় 'সাবাস প্রফেসর শঙ্কু' গ্রন্থ। এর অন্তর্ভুক্ত গল্প গুলি হল –'আশ্চর্য প্রাণী', 'কর্ভাস', 'স্বপ্নদ্বীপ', 'ডক্টর শেরিং এর স্মরণশক্তি' ইত্যাদি।

৪)১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয় 'মহাসংকটে শঙ্কু' গ্রন্থ।এর অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলি হল– 'শঙ্কুর শনির

দশা', 'শঙ্কুর সুবর্ণ সুযোগ' ইত্যাদি।

৫)১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয় 'স্বয়ং প্রফেসর শঙ্কু'গ্রন্থ। এর অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলি হলো– 'মানরো দ্বীপের রহস্য', 'একশৃঙ্গ অভিযান' ইত্যাদি।

৬)১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয় 'শঙ্কু একাই একশো'গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্প গুলি হল– 'শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান','মহাকাশের দূত' ইত্যাদি।

৭)১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয় 'পুনশ্চ প্রফেসর শঙ্কু'গ্রন্থ।এর অন্তর্ভুক্ত গল্প গুলি হল 'শঙ্কু ও আদিম মানুষ', ' শঙ্কুর পরলোক চর্চা' ইত্যাদি।

৮)১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয় 'সেলাম প্রফেসর শঙ্কু'গ্রন্থ। এর অন্তর্ভুক্ত গল্প গুলি হল 'নেফ্রুদেৎ এর সমাধি', 'স্বর্ণপদী', 'প্রিস্টোবাল্ডির ভবিষ্যৎবাণী' ইত্যাদি।

এরপর সত্যজিতের সৃষ্ট আর একটি অনন্য চরিত্র হলো তারিণী খুড়ো। তিনি হলেন একজন অবিবাহিত মজলিশি বৃদ্ধ। যিনি নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্প বলতে ভালোবাসতেন।তার বেশিরভাগ গল্প ছিল অলৌকিক বা ভূতের। এই ধরনের গল্পগুলিতে তার উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা এবং তীক্ষ্ণ বিচক্ষণতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সত্যজিৎ রায়ের তারিণীখুড়ো সিরিজের জনপ্রিয় গল্প গুলি হল–

১) ডুমনিগড়ের মানুষখেকো,
২) মহারাজা তারিণীখুড়ো,
৩) মহিম সান্যাল এর ঘটনা,
৪) কনওয়ে কাসলের প্রেতাত্মা,
৫) তারিণী খুড়ো ও বেতাল,
৬) টলিউডে তারিণীখুড়ো,
৭) জুটি,
৮) ধূমল গড়ের হান্টিং লজ ইত্যাদি।

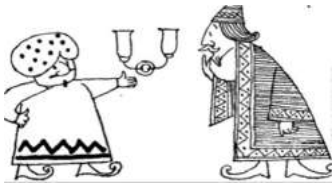

সত্যজিৎ রায় মধ্যপ্রাচ্যের মোল্লা নাসিরুদ্দিনের অনেকগুলি গল্প সংগ্রহ করে 'মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন।

এছাড়াও একটি কিশোরকে নিয়ে রচিত 'ফটিকচাঁদ', একজন হরবোলার কাল্পনিক জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে রচিত 'সুজন হরবোলা', বঙ্কুবাবুর বন্ধু, টেলিফোন অসমঞ্জ বাবুর বন্ধু ইত্যাদি ছিল সত্যজিৎ রায়ের অসামান্য সাহিত্যকর্ম।

তিনি ভৌতিক গল্পকার হিসেবে দারুণ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তার ভূতের গল্প গুলি চলতি ভূতের গল্প থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের ও ভিন্ন রসের। যা পাঠ করলে আবালবৃদ্ধবনিতা অলৌকিক ও রোমহর্ষক অনুভূতি লাভ করে। এই শ্রেণীর গল্প গুলির মধ্যে অন্যতম হলো–গগন চৌধুরীর স্টুডিও, ব্রাউন সাহেবের কুঠী, কাকতাড়ুয়া ইত্যাদি।

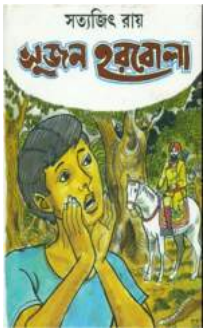

সত্যজিৎ রায় তার বেশ কিছু ছোটগল্পে সামাজিক পরিবেশ কিঞ্চিত হাস্যরসের দ্বারা অনবদ্যভাবে তুলে ধরেছিলেন।যার মধ্যে ছিল একটি বিশেষ দীপ্তি যা পাঠককে গভীরভাবে আকর্ষণ করত। যেমন– পটলবাবু ফিল্মস্টার, ক্লাসমেট, বিপিনবাবুর স্মৃতিভ্রম ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যে সত্যজিৎ রায় এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র।তিনি তাঁর অসামান্য সাহিত্যকর্ম, চলচ্চিত্র পরিচালনা ইত্যাদির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মঞ্চে অসংখ্য সম্মান লাভ করেছেন। এই বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিকের ছোটগল্প গুলি সকল প্রজন্মের মনের মনিকোঠায় চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছে।

সত্যজিতের সর্বজয়া

দীপা পাল

'অবন ঠাকুর যদি ছবি লেখেন তুলি দিয়ে, তা হলে সত্যজিৎ রায় লেখেন ক্যামেরায়।' পঞ্চাশের দশকের সেই স্বপ্নসন্ধানী নবীন পরিচালকের হাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' (১৯৫৫)। তিনি এই কাহিনীর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন সত্যিকারের জীবনের প্রতিচ্ছবি। একটি সংসারের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন সারাদেশের অজস্র সংসারের দৈনন্দিনতার কঠিন সংগ্রাম। 'পথের পাঁচালী ' হচ্ছে প্রকৃতি ও মানব চরিত্রের বর্ণনাময় উপন্যাস। পাঁচালীর এই পথ অতিক্রম করে চলেছে নিরন্তর, কেন্দ্রীয় সেই মানুষগুলো –অপু, দুর্গা, সর্বজয়া, হরিহর, ইন্দির ঠাকুরণ –এদের বিভূতিভূষণ বুনেছেন এক মানবিক টানাপোড়েনের অন্তরঙ্গ বয়ানে।

চরিএ নির্বাচনে সত্যজিৎ রায় বরাবরই খুব সতর্ক। ভাষা নয়,ভঙ্গী তাঁর প্রধান অবলম্বন। প্রথাগত নায়িকার ছাঁচ ভেঙে সর্বজয়ার চরিএে তিনি বাছলেন চটপটে, স্মার্ট, প্রখররূপিনী নিজ বন্ধুপত্নী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিভূতিভূষণের সর্বজয়া আত্মপ্রকাশ করে একজন সুন্দরী গ্রাম্যবধূ হিসাবে। সত্যজিৎ রায় তার পরিবর্তে বাছলেন লম্বাটে মুখের ব্যক্তিত্বময়ী শহুরে শিক্ষিতা করুণাকে। সত্যজিতের কথায় – 'গ্রামের বৌমানুষ বলতে যা বুঝি, এই ভদ্রমহিলা অবশ্য মোটেই সেই গোএের নন। ইনি শহুরে পরিবারের গ্রাজুয়েট মহিলা।... আমার মনে হয়েছিল যে, চেহারার দিক থেকে ওই ভূমিকায় এঁকে ঠিকই মানিয়ে যাবে।' 'সর্বজয়া আর সেই' বিভূতিভূষণীয় সর্বজয়া'থাকল না। সত্যজিতের এই চরিএ নির্বাচনী প্রমাণ করে তাঁর অসাধারণত্ব। আর কোনো চেহারায় যেন ও চরিএ মানায় না।

স্ত্রী রূপে সর্বজয়া জীবনের কোনো সাধই পূরণ করতে পারলে না, কিন্তু তার জন্যে কোনো আক্ষেপ নেই। মাতৃরূপেও সন্তান-সন্ততিকে পেট ভরে খেতে দিতেও পারে না। কিন্তু তাদের বাঁচাবার জন্যে কি দুর্জয় চেষ্টা। আমরা দেখি হরিহর একটু অলস প্রকৃতির। হাতে পায়ে নয়, মানসিক দিক থেকে। জীবনে উন্নতি করার ইচ্ছে খুব একটা তার মধ্যে নেই। আগাগোড়া সে একটু ভবঘুরে প্রকৃতির। আর এমন স্বামীর স্ত্রী হলে যা যা বিপর্যয় সহ্য করা কর্তব্য, সর্বজয়াও ঠিক তেমনটিই করেছে। তার মধ্যেও সে বাঁচিয়ে চলেছে পরিবারের মর্যাদা – চুপি চুপি ভোরে উঠে থালাবাসন বন্ধক দিয়ে চাল কিনেছে, তবু মুখ ফুটে চরম অভাবের কথা পরম হিতৈষী প্রতিবেশীর কাছে বলতে যায়নি। ভারতীয় নারীত্বের এই যে বৈশিষ্ট্য; বুক ফাটলেও মুখ না ফোটার, তা করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। আর সেই অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে সত্যজিৎ রায় বলেন –'করুণা শহরের মেয়ে। কিন্তু শহুরে হাবভাব বিসর্জন দিয়ে দিব্যি সে যেন সর্বজয়ার একেবারে অন্তরাত্মার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল।'

'ছেলে-মেয়ে তার, সংসারটিও তার, অভাব-অনটন- অসুখ বিসুখ সংকীর্ণতাও একান্ত তারই।তার মুখের অকালরেখায় শতজ্বালা পোড়া সমেত প্রায় ডুবে যাওয়া সংসারখানিকে ঠেলে চলার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। দুর্যোগ থেকে বাঁচার জন্যে ঘরের নতুন চাল, ছেলেমেয়ের মুখে দুবেলা দুমুঠো ভাত, স্বামী সন্তানের নীরোগময় জীবন – এটুকুই কেবল তার চাওয়া। আনন্দের কচিৎ মুহূর্তেও আবেগের রাশ সে টেনে রাখে। ছেলে অপুর জন্ম হলে অভিমানী ইন্দির ঠাকুরণ যখন সব মান ভুলে নবজাতককে দেখতে আসে তখন সর্বজয়া ছেলের মুখ থেকে কাঁথা সরিয়ে দেয় শুধু, সর্বজয়ার মুখভাবের কোনো পরিবর্তন হয় না। এই রকমই ব্যক্তিত্ব সর্বজয়ার। এই তার চরিত্রের বহুমুখীনতা। দুর্গার দুষ্টুমিতে তাকে চুলের মুঠি ধরে মারা কিংবা ইন্দির ঠাকুরণের সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া, এসকল

নিষ্ঠুরতা তাকে বেশ মানায়। এই অদ্ভুত কাঠিন্যের আড়ালে তার মাতৃলাবণ্য ফুটে বার হয় 'অপু' ডাকের মাধ্যমে। একাধারে স্নেহময়ী মা আবার প্রয়োজনে নিষ্ঠুরতা যা করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে সর্বজয়াকে এক অন্যমাত্রায় পৌঁছে দেয় । সত্যজিতের কথায় –'সর্বজয়া চরিত্রের দুটো দিক –একটা মমতাময়, অন্যটা নিষ্ঠুর –এই সবকিছুর দ্বারাই আমি আকৃষ্ট হই।'

ছেলেকে ঘিরেই তার যত স্বপ্ন। ছোট্ট অপু যখন প্রথম পাঠশালে যাবে তখন দুর্গার তার চুল আঁচড়ে দেওয়া সর্বজয়া পাশে দাঁড়িয়ে দেখে নীরবে, তখন তার সেই নীরব চাহনি কি ভবিষ্যতের কোনো রঙীন স্বপ্নের জাল বোনে না? কিন্তু কোথায় সেই রঙীন স্বপ্ন ? কোথায় সেই সুখের দিন ? নিশ্চিন্দিপুর থেকে কাশী কোথাও সেই সুখের খোঁজ মেলে না। সর্বজয়ার সেই দৃঢ় ব্যক্তিত্ব মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যায় দুর্গার অসহায় মৃত্যুতে।এই বেদনার সুর যেন কোথাও জানান দেয় সর্বজয়ার পরাজয়ের সংবাদ।

'অপরাজিত 'তে এই সর্বজয়ার সম্পূর্ণ অন্যরূপ দেখা যায়। সেই ব্যক্তিত্বময়ী গৃহিনীর চোখে মুখে ফুটে ওঠে ভয়, হতাশা, সংশয়। গ্রামের জটিলতা একরকম, কিন্তু শহরের জটিলতায় সর্বজয়া থই পায় না। স্বাধীন সংসারের গৃহিণী থেকে দাসীবৃত্তিতে অধঃপতন যা তার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। 'অপরাজিত ' ছবিতে সর্বজয়া প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায় বলেন –' 'অপরাজিত' ছবিতে সেরা অভিনয় করেছেন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাকা অভিনেত্রীর মতো এখানে তিনি সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ।... অভিনেত্রী হিসাবে তিনি যে কী প্রতিভাশালিনী, অপরাজিত ছবিতে তা তিনি বুঝিয়ে দেন।'

এরপর সর্বজয়ার জীবনে শুরু হয় আরো এক টানাপোড়েন । যেখানে সর্বজয়া সেই গ্রামীণ পরিবেশ বা সেই গ্রাম্য মনোভাব থেকে বেরোতো পারে না। ছেলের পুরোহিতগিরির স্বপ্নে সে আটকে থাকে, যেখানে তার ছেলে হাত বাড়াচ্ছে উচ্চতর শিক্ষার দিকে। যা মা ও ছেলের সম্পর্কে এক ফাটলের সৃষ্টি করে। অপুর এই বদলে যাওয়ার সামনে সর্বজয়ার চাহনি, ভাবভঙ্গী, হাঁটাচলা এক আশ্চর্য চরিত্রায়নের নমুনা। ছেলের এই পরিবর্তনের সঙ্গে সর্বজয়াও কখনো চেতনে কখনো অবচেতনে তিলতিল করে কেমন অসহায় পাল্টে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে সর্বজয়ার মুখের এক একটি রেখা। অন্যদিকে অপু তার মায়ের বাঁধন ছেড়ে বাইরের জগতের প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়ে যায় যে মায়ের মৃত্যু সংবাদটা ক্ষণিকের জন্য হলেও অপুর মনে একটা আনন্দ, একটা মুক্তির নিঃশ্বাস, একটা বাঁধন ছেড়া উল্লাসের ন্যায় ধরা দেয়।

ছেলেকে বোঝা না বোঝার এই পরাজয়বোধ, মান–অভিমান, আশা–নিরাশার দোলাচলে সত্যজিতের দেখানো সেই জোনাকীর নাচ দেখতে দেখতে সে মৃত্যুতে লীন হয়ে যায়।

সত্যজিতের শঙ্কু: রহস্য উন্মোচন ও ব্যর্থতা

সুশান্ত পাত্র

সম্ভ্রান্ত ঐতিহ্যবাহী বংশের নাম যিনি দেশ থেকে বিদেশের দরবারেও জনপ্রিয় করে তুলেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম সত্যজিৎ রায়। তাঁর কথা মনে পড়লেই আবছা অবয়বে মহাভারতের অর্জুন মানস পটে ভেসে ওঠে। অর্জুনের মতোই সত্যজিৎ রায়ও সব্যসাচী। তাঁর দু'হাতের (প্রোফেসর শঙ্কু ও ফেলুদা) জনপ্রিয়তা পাঠককে বারে বারে রহস্যের দরবারে হাজির করেছে। তিনি উপহার দিয়েছেন যেমন একের পর এক বিস্ময়কর আবিষ্কারের; তেমনি ফেলুদার ভূমিকায় নানা রহস্যের জালও উন্মোচন করেছেন। পাঠককে তাই কখনো যেতে হয় (প্রোফেসর শঙ্কুর সাথে) কঙ্গো অভিযানে, উড়ন্ত লামার সন্ধানে, বা তার দেখা স্বপ্নদ্বীপে; কখনো আবার ফেলুদার হত্যাপুরী, কাঠমান্ডু, কিংবা বাদশাহী আঙটির রহস্য উন্মোচনে। এভাবে কাহিনীর মধ্যে পাঠক নিজেই কখন ডুবে যান তার ইয়ত্তা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের বেশিরভাগ সময় থাকে না। সম্মোহিতের মতো আমরা তখন কাহিনীর প্লটে প্লটে কেবল জড়িতে যেতেই থাকি। এক্ষেত্রে আমাদের ইন্দ্রিয়কে দোষ দেওয়া যায় না, দিলে লেখকের লেখনী শক্তির গুণপনাকে মুর্খামীসহ ছোট করা হয়। লেখকের এই গুণপনার কথা মাথায় রেখে এখানে প্রোফেসর শঙ্কুর নানা আবিষ্কার ও তার কার্যকলাপের উপর আমাদের পর্যবেক্ষণীর আলো স্থির রাখব।

সত্যজিৎ রায়ের (গিরিডির) ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু বাঙালি হলেও পুরোপুরি আমাদের কাছের বাঙালি নন। সে তুলনায় ঘনাদা, টেনিদা, ব্যোমকেশ বক্সী অনেক কাছের; এমনকি ফেলুদাকেও অনায়াসে আমরা কাছে টেনে নিতে পারি। কিন্তু শঙ্কুর ভাবগাম্ভীর্য উক্ত সবার থেকে কিছু অন্য রকমের। এটা তার বিজ্ঞানমনস্ক ভাবচিন্তার প্রভাব বলেও ধরা যেতে পারে। পরোক্ষে তার প্রতি আমাদের অসীম শ্রদ্ধাও হতে পারে। শঙ্কুর বিস্ময়কর আবিষ্কারের আলোক এতটাই আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয় যে, শঙ্কু আমাদের ভেতো(ভাত) বাঙালি, মেছো বাঙালি – এ কথাটা সহজে যেন হজম হয় না। সেজন্য তাই তার কাঁধে কাঁধ মেলানোর আশা ছাড়াও হাত মেলানোর আশাও – চরম স্পর্ধার মনে হয়।

ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর পরিচয়—বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রূপে। জন্ম ১৬ই জুন। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে তার অবাধ গতি। সমুদ্রের তলাতেও তাকে যেতে দেখেছি আবিষ্কারের নেশায়। তার এই সমস্ত ঘটনার বর্ণনা থাকে 'অবিরত রং পরিবর্তিত হওয়া অক্ষয়ী ডায়েরি'তে। আগুনে কিংবা কুকুরের কামড়েও সে ডায়েরির অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়না। সেটাই প্রোফেসর শঙ্কুর জীবনপঞ্জী, তার পাতার প্রতিটি পরত ঘটনার নানা জীবন্ত ছবিতে সাজানো। সারাজীবনে 'বটিকা ইন্ডিকা', 'মিরাকিউরল', 'অ্যানাইহিলিন পিস্তল'এর মতো অনেক নিত্য-নতুন আবিষ্কারের সাথে তিনি যুক্ত থেকেছেন। কিন্তু আবিষ্কারের পাশাপাশি তার যে এডভেঞ্চারের প্রতি লোভ—তা থেকে প্রমাণিত হয়- তিনি শুধু একজন বৈজ্ঞানিক নন, সফল গোয়েন্দাও বটে। তার ডায়েরির 'ডঃ শেরিং এর স্মরণশক্তি', 'শঙ্কুর শনির দশা', 'একশৃঙ্গ গন্ডার' ও 'শঙ্কু ও আদিম মানুষ' – ইত্যাদি কাহিনীর মধ্যে তিনি যোগ্য গোয়েন্দার ভূমিকা পালন করেছেন। গ্রোপিয়াসের চক্রান্তে নকল শঙ্কু আসলের জীবনে শনি-স্বরূপ উপস্থিত হলে শঙ্কুকে সরাসরি তখন মাঠে নামতে দেখা গেছে। কেননা, এক জাল শঙ্কুর বক্তৃতায় সে তার সারা জীবনের মেহনতকে পন্ড করতে চায়নি। প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ মাঠে নেমে সে ফিংকেলস্টাইন খুনের আসল অপরাধী ও তার সঙ্গীর(নকল শঙ্কুর) রফাদফা করে। ডায়েরির বর্ণনা অনুযায়ী– "কফিনের ভিতর বিশাল দুটি নিষ্পলক পাথরের চোখ নিয়ে যিনি শুয়ে আছেন তিনি হলেন আমারই ডুপ্লিকেট – শঙ্কু নাম্বার টু।" এই কাহিনীর সমস্ত ঘটনাই চরম উৎকণ্ঠায় শঙ্কুর সাথে সাথে পাঠককেও গোয়েন্দাগিরিতে নিযুক্ত করে।

অন্যদিকে, অত্যাশ্চর্য 'রিমেমব্রেন' যন্ত্র শঙ্কুর আবিষ্কার জীবনের আরেক সফল পদক্ষেপ। তার মাধ্যমে ব্যক্তির হারানো স্মৃতি একের পর এক ফিরে আসতে থাকে। এই যন্ত্র আবিষ্কারের পর আরো একবার শঙ্কুকে গোয়েন্দার পোশাক গায়ে চড়াতে দেখা গেছে। গাড়ি দুর্ঘটনায় ডঃ শেরিং এর আত্মস্মৃতি লোপ পেলে সেখানে ডাক পড়ে যন্ত্র সহযোগে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ভারতের ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর। যন্ত্রের কার্যকারিতায় শেরিং এর স্মৃতি ফিরে আসে। পাশাপাশি জানা যায় তার কদর্য রূপের আরেক দিকের। এক আনবিক মারণ অস্ত্রের ফর্মুলার জন্য শেরিং ডঃ লুবিনকে হত্যা করেছে। সে দৃশ্য ড্রাইভার দেখে ফেললে ভয়ে-আতঙ্কে গাড়ির স্টিয়ারিং ঘুরে গিয়ে উক্ত গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটে যায়। এই রহস্যের সন্ধান পায় শঙ্কু শেরিংএর চুরুটের বাক্স থেকে। শেরিং সাধারণত চুরুট খান না, তা সত্ত্বেও তার কাছে পাওয়া চুরুটের বাক্স শঙ্কুকে রহস্যের আভাস দেয়। আর এই আভাসের সূত্রেই কাহিনীর আসল

ঘটনা সামনে আসে–"ঢাকনাটা খুললে বেরোয় চুরুট, আর নীচের দিকে একটা প্রায় অদৃশ্য বোতাম টিপলে খুলে গিয়ে বেরোয় মাইক্রোফোন সমেত একটা খুদে টেপ রেকর্ডার। টেপটা চালিয়ে দেখেছে তাতে বি–এক্স তিনশো সাতাত্তরের সব তথ্যই রেকর্ড করা আছে পেরিং এর নিজের গলায়।" এই কাহিনীতে নতুন আবিষ্কারের চেয়ে প্রোফেসর শঙ্কুর গোয়েন্দার ভূমিকাটাই বেশি আকর্ষণীয়। এভাবে একটা 'কোল্ড ব্লাডেড' হত্যাকারীর আসল রহস্য তিনি পরতে পরতে উন্মোচন করেছেন।

'শঙ্কু ও আদিম মানুষ'– কাহিনীতে শঙ্কু আরেক কপট বৈজ্ঞানিকের মেকী মুখোশ উন্মোচন করেছেন। সেখানে বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ ডাঃ হাইনরিখ তার আবিষ্কৃত আদিম মানুষকে দেখার জন্য ভারতীয় বিজ্ঞানী প্রোফেসর শঙ্কুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেই আদিম মানুষের উচ্চতা প্রায় ছ' ফুটের কাছাকাছি। তার অন্যান্য কার্যকলাপের মধ্যে বিশেষ ভাবে নজরে পড়ে তার বামহাতে কাজ করবার ক্ষমতা। পাথর ছোঁড়া, পাতা–লতা ছেঁড়ার মতো অনেক কাজই সে তার বাম হাতের সাহায্যে করে থাকে। কিন্তু এই লেফ্‌টহ্যান্ডেড প্রকৃতির জন্যই শঙ্কুর খটকা লাগে। উল্লেখ্য যে, শঙ্কু সদ্য আবিষ্কার করেছে একটা ওষুধ, যার সঙ্গে 'এলিক্রিয়াম' মেশালে সেটা আদিম মানুষকে বর্তমান মানুষে পরিণত করে। নাম আর 'এভলিউশান'। এর সাহায্যে অবশেষে হাইনরিখের ভন্ডামির মুখোশ খুলে পড়ে। সে তার আদিম মানুষকে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু শঙ্কুর বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতায় তা সম্ভব হয়নি। 'এভলিউশান' সেই আদিম মানুষের উপর প্রয়োগ করলে কিছু পরে তার আসল রূপ সামনে আসে। ডায়েরির ভাষায়– "পনেরো মিনিটের মাথায় বোঝা গেল, আমরা যাকে দেখছি সে ব্রাজিলের কোনোও উপজাতির অন্তর্গত নয়; সে ইউরোপের অধিবাসী, তার গায়ের রং আমার বন্ধুদেরই মতো। তার মাথার চুল সোনালী, তার শরীর দেখলে মনে হয় না তার বয়স ত্রিশের বেশি, তার নাক–চোখে বোঝা যায় সে সুপুরুষ।...এ যে হেরমান বুশ।" একটা সভ্য মানুষের উপর ওষুধ প্রয়োগ করে ডাঃ হাইনরিখ যে আদিম মানবের সৃষ্টি করেছিল। সেই আদিম মানবকে আবার ওষুধের প্রয়োগে শঙ্কু সভ্য মানুষে পরিণত করেছে। উল্লেখ্য, ওই হেরমান বুশ হাইনরিখেরই একজন কাছের বন্ধু ছিলেন। যাকে বন্ধুর মর্যাদা দেওয়া দুরের কথা, তাকে নিজেরই বৈজ্ঞানিক প্রয়োগে ল্যাবের পুতুলে পরিণত করতে চেয়েছে। ঠিক যেমন ভাবে অন্য কাহিনীতে শঙ্কুকে ছোট্ট পুতুলে পরিণত করেছিল নরওয়ের গ্রেগর লিন্ডকুইস্টা। সেখানে শঙ্কুকে বলতে শুনি– "আমি ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু – সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স কর্তৃক সম্মানিত বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি বৈজ্ঞানিক – আজ একজন নরউইজিয় পাগলের হাতে পুতুল অবস্থায় বন্দী।"

'রক্তমৎস্য রহস্যের' মধ্যে আমরা আরেক রোমান্সের স্বাদ আস্বাদন করি। স্টেটসম্যান পত্রিকার খবরে শঙ্কু রক্তমৎস্যের সন্ধানে নেমে পড়ে সমুদ্রগর্ভে। বিজ্ঞানী হামাকুরা তানাকা ও প্রতিবেশী অবিনাশচন্দ্র মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে পরস্পর সমুদ্রগর্ভে অবশেষে দশ হাজার ফুট নীচে গিয়ে তারা দেখেছে আগুনের একটা গোলক। শঙ্কুর বাইনোকুলারে দেখা দৃশ্যানুযায়ী বর্ণনা, – "দেখলাম – সেটা আগুন নয়, সেটা মাছের মেলা।... তাদের গা থেকে একটা লাল আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তাদের দুর থেকে একটা অগ্নিকুন্ড বলে মনে হচ্ছে।" এদের পাশে একটা 'লাল গোলক' তেরছা খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত। সবচেয়ে আশ্চর্যের যে, মাছগুলো লাল গোলকের কাছে গেলেই নির্জিব হয়ে পড়ছে। কিছুক্ষণ দেখার পর শঙ্কুদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে– ওটা আসলে একটা রকেট। সাবমেরিনের ধাক্কায় তার দরজা খুলে গেলে মুহূর্তে মাছগুলো তার ভেতরে ঢুকে পড়ে। আর তার পরে পরেই রকেটটা বিদ্যুৎবেগে আকাশে উঠে অদৃশ্য হয়ে যায়। -- এ গল্পে প্রোফেসর শঙ্কুর সাথে সাথে আমরাও রোমান্সের সম্মুখীন হই। কারণ এখানে আবিষ্কারের চেয়ে রোমান্সের গন্ধই বেশী তীব্র। এমনই দেখেছি মানরো দ্বীপের রহস্যে। পাঁচ বিজ্ঞানী সহ শঙ্কুরা সেখানে সন্ধান পেয়েছিল মেহগনির গাছের গুঁড়িতে একপ্রকার পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের। তার ফল সুস্বাদু, রঙ নীলচে প্রকৃতির। ডাঃ মানরো বর্ণিত এটাই সেই অমৃত ফল। যা খেলে মানুষের অদম্য ক্ষিদের উৎপত্তি হয়, সাথে সব রোগের নিষ্পত্তিতে অক্ষয় পরমায়ু লাভ হয়। কিন্তু এর এতো গুণ থাকা সত্ত্বেও শঙ্কু একে অমৃত ফল বলতে নারাজ। কেননা, ক্ষিদেয় মানুষেরা যদি পশুতে পরিণত হয়, নিজেদের আত্মসংযম হারায়; তাহলে মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। শঙ্কুর মতে– "এই ফলকে অমৃত বলা উচিত কিনা সে বিষয়েও আমার মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এই তিন মাসের মধ্যে মানুষগুলো সব পশুতে পরিণত হতে চলেছে। আমিও কী পশুর স্তরে নেমে যাচ্ছি? এই যে চিরকালের জন্য রোগ মুক্তি, আর তার সঙ্গে এই যে অদম্য ক্ষুধা, এটা কি মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর?" –এই মানসিকতা শঙ্কুর বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ছাপিয়ে তাকে আরো বড়ো করে তুলেছে। আর এই মানসিকতাই তাকে সফল বিজ্ঞানী থেকে সফল হিতবাদী মানুষের পর্যায়েও উন্নীত করেছে। যে মানুষ মানীর মান দিতে জানে, অমূল্য বস্তুর কদর করতে জানে, এমনকি দশের মঙ্গলের জন্য নব আবিষ্কৃত জিনিসের বিনাশও করতে জানে। তাই 'গোলোক রহস্যে' শঙ্কু 'টেরাটম'এর (রোগ বহনকারী বষাক্ত ভাইরাসের আবাসস্থল) আসল রহস্য জানতে পারলে তাকে নষ্ট করেদিতে উদ্যত হয়। কেননা ছাড়া পেলে এরা সমস্ত পৃথিবী শেষ করে দিতে পারে। তাই তাদের বাঁচার মূল উপাদান(অক্সিজেন) বন্ধ করে দিয়ে শঙ্কু ভেবেছে– "টেরাটম গ্রহের প্রাণীদের বাঁচাতে গিয়ে সমস্ত পৃথিবীর লোকের জীবন বিপন্ন করা চলে না।" শঙ্কুর এই মানসিকতা মিশরের কায়রোতে কৃত্তিম হিরে তৈরী করার পরেও দেখেছি। সেখানে শঙ্কু সহকারী নেফ্রুদেৎ এর ফর্মুলা অনুযায়ী উনিশ ঘন্টা গবেষণা করে কৃত্তিম হিরে জন্ম দিয়েছে।

ভারতে যার নাম কোহিনুর। কিন্তু পরক্ষণেই সে সেই ফর্মুলার কাগজ ছিঁড়ে নীলনদের জলে ফেলে দিয়েছে। তার মনে হয়েছে– "হিরের দুষ্প্রাপ্যতাই তার মূল্যের ও তার অসামান্য কদরের কারণ।" – উল্লেখ্য, এমন মহৎ ভাবনাই তাকে ত্রিলোকেশ্বর বিজ্ঞানীতে পরিণত করেছে। যার দৌড় বিজ্ঞানের পাশাপাশি অবিজ্ঞানের শাখাতেও।

তবে তার এসব অসামান্য সফলতার পাশাপাশি মাঝে মাঝে ব্যর্থতাও নজরে আসে। এমন উদ্ভট–অবিশ্বাস্য–অবিশ্লেষণযোগ্য বিষয়ের সামনে তাকে মাঝে মাঝে পড়তে হয়েছে যে, নিজের অজান্তেই হার মেনে নিতে হয়েছে। যেমন, মস্ত চিনা জাদুকর চী–চিং লন্ডনে শঙ্কুকে 'হিপনোটাইজ' করতে গিয়ে ব্যর্থ হন, সেই সূত্রে তিনি ভারতে আসলে সোজা শঙ্কুর বাড়িতে ওঠেন। আর এখানেই বাড়ির ছোট্ট টিকটিকিকে মারাত্মক এসিড খাইয়ে বৃহৎ ড্রাগনে পরিণর করেন। সেই ড্রাগনকে শঙ্কু ৪০০ ভোল্টের অ্যানাইহিলিন পিস্তল দিয়েও নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। শঙ্কুর কথায়– "আমার ঘরে পোষা টিকটিকি আজ ড্রাগনের রূপ ধারণ করেছে, আর এই ড্রাগনের প্রিয় পানীয় হল আমার এই মারাত্মক এসিড।" এটা হয়েছে পুরোপুরি চী–চিং এর কারসাজিতে। --এই ঘটনায় বাহ্যিকভাবে শঙ্কুর হার হয়েছে। কেননা, সে এই কারসাজির রহস্য উন্মোচন করতে পারেনি। তবে শঙ্কুর পরাজয় ঘটলেও বিজ্ঞানের জয় ঘটেছে অবশ্য। এখানে একজন সফল জাদুকরের কারসাজীতে ভেলকির পাশাপাশি বিজ্ঞানের সহায়তার সার্থক প্রয়োগ দেখা গেছে। আবার বিহারের ঝাঝায় দয়ারাম বোসের ছেলে খোকা হঠাৎ রূপান্তরিত হয়েছে জ্ঞানবৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকে। পৃথিবীর সমস্ত আশ্চর্য বস্তুর নাম তার জিভের আগায়। সমস্ত একজিবিশনে তার বুদ্ধি পরীক্ষা হয়েছে। সমস্ত পরীক্ষা দিতে দিতে খোকা একসময় জার্মান ভাষায় বলেছে– 'আমি ক্লান্ত'। এই রহস্যেরও সমাধান করতে নেমে শঙ্কু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। কেননা "পৃথিবীর ইতিহাসে খোকার এ ঘটনা একেবারে অনন্য ও অভূতপূর্ব।" শেষ পর্যন্ত খোকা নিজের তৈরী সলিউশান খেয়ে নিজেই ঠিক হয়েছে। এঘটনা শঙ্কুর ধরাছোঁয়ার একেবারে বাইরে, এমনকি তার গবেষণারও অতীত। এ বিষয়ে দশ–বারো খানা বই পড়েও পরিণামে নিরাশা ছাড়া কিছু জোটেনি তার। এমন ব্যর্থতার স্বাদ আরো পেয়েছে শঙ্কু 'ঈজিপ্সীয় আতঙ্কে' ও 'প্রোফেসরশঙ্কু ও হাড়' কাহিনীতে। যার একটাতে দীর্ঘ দিনের মমির অবিকৃত দেহ সামান্য রাস্তার এক পাগলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পচন ধরতে আরম্ভ করে। অন্যটাতে, পশুর ছড়ানো কঙ্কালসার হাড়ের মধ্যে এক সাধুর কারসাজীতে ভেলকির মতো রক্ত–মাংসের আগমণ, ও প্রাণ সঞ্চার হয়েছে। এ সমস্ত ঘটনার কারণ শঙ্কুর বিজ্ঞানমনস্ক গবেষণায় সঠিকভাবে ধরা পড়েনি। শঙ্কু এখানেও রহস্য উন্মোচনে ব্যর্থ হয়েছে। সে ব্যর্থতার বর্ণনা রয়েছে এভাবে– "আর সেই বিরাট কঙ্কালের পাঁজরের ফাঁক দিয়ে দেখলাম এক নরকঙ্কাল। সাধুবাবার মৃতদেহ জানোয়ারের সঙ্গে সঙ্গেই কঙ্কালে পরিণত হয়েছে।"

এতএব, প্রোফেসর শঙ্কু বিভিন্ন রহস্য উন্মোচনের পাশাপাশি অনেক রহস্যের কিনারা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাসত্ত্বেও একথা বলতে হয় যে, ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু ছোটো–বড়ো নির্বিশেষে সবার মনে সমভাবে স্থান পেয়েছে। শঙ্কুর গবেষণার পাশাপাশি রহস্য উন্মোচন ও ডিডেকটিভ সুলভ মানসিকতা তাকে অনন্যতা দান করেছে। আর এসবের মধ্যে উক্ত ছোটখাটো ব্যর্থতাই যেন শঙ্কুকে কল্পবিজ্ঞানের জগত থেকে আমাদের বাস্তবের কাছাকাছি অনেকটা পৌঁছে দিয়েছে। যদি তার এই ব্যর্থতা না আসত, তাহলে হয়তো প্রোফেসর শঙ্কুকে পাঠকের অনেকটা রোবটের মতো মনে হতে পারতো। যে কখনোই কোনো গবেষণায় অসফল থাকত না। লেখক সেদিকে শঙ্কুকে না নিয়ে গিয়ে যথার্থ বৈজ্ঞানিকের সম্মান দিয়েছেন পাঠকের দরবারে। এভাবে লেখকের শঙ্কু পাঠকের হৃদয়ে চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে।

<u>সহায়কপঞ্জী</u>

১। প্রোফেসর শঙ্কুঃ প্রথম গল্প সংকলন, ১৯৬৫, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলিকাতা।
২। প্রোফেসর শঙ্কুর কান্ডকারখানাঃ দ্বিতীয় গল্প সংকলন, ১৯৭০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা।
৩। সাবাস প্রোফেসর শঙ্কুঃ তৃতীয় গল্প সংকলন, ১৯৭৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা।
৪। মহাসংকটে প্রোফেসর শঙ্কুঃ চতুর্থ গল্প সংকলন, ১৯৭৭, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা।
৫। স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কুঃ পঞ্চম গল্প সংকলন, ১৯৮০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা।
৬। শঙ্কু একাই ১০০: ষষ্ঠ গল্প সংকলন, ১৯৮৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা।
৭। পুনশ্চ প্রোফেসর শঙ্কুঃ সপ্তম গল্প সংকলন, ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা।
৮। সেলাম প্রোফেসর শঙ্কুঃ অষ্টম গল্প সংকলন, ১৯৯৫, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা।
৯। সত্যজিতের ভাবনায় প্রোফেসর শঙ্কুঃ সুখেন বিশ্বাস, ২০০০, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত তিন কন্যা সিনেমার নারী চরিত্র

নাফিসা খাতুন

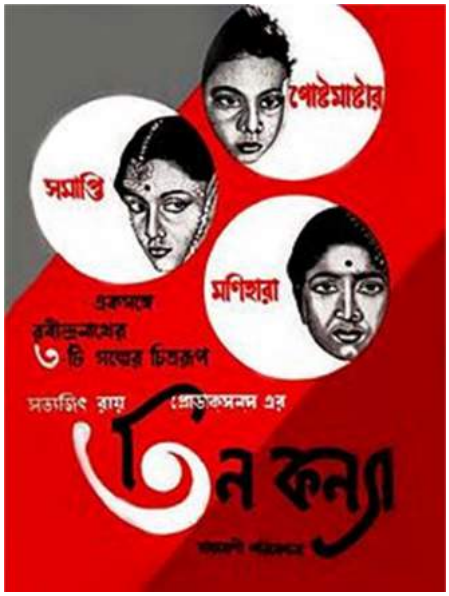

সত্যজিৎ রায়ের লেখা গল্প উপন্যাস ও ছোটগল্প এর মধ্যে ক্ষণিকের জন্য নারী চরিত্র বা নারীত্বের ব্যাপ্তি আমাদের ঠিক সন্তুষ্ট করে না। তবে আমরা বোধহয় খানিকটা আশ্বস্ত হয়। হাঁপ ছেড়ে বলি, যাক! সে ব্রহ্মান্ডে অন্তত নারীর অস্তিত্ব আছে। কিন্তু ক্যামেরার পেছনে দাঁড়িয়ে সত্যজিৎ রায় যেন হয়ে গেলেন ভিন্ন এক মানুষ। ভীষণ সাবলীলভাবে রুপালি পর্দায় ফুটিয়ে তুললেন নারীর অনুভব আর টানাপোড়েন, আকাঙ্ক্ষা আর অভিলাষের গল্প। ঠিক তেমনি কিছু টানাপোড়েন গল্পকে কেন্দ্র করে সত্যজিৎ রায় 'তিন কন্যা' চলচ্চিত্রের নির্মাণ করেন।

চলচ্চিত্রযাত্রার শুরু থেকেই সত্যজিৎ রায় প্লট নির্বাচনের জন্য সাহিত্যে সন্ধান করতেন। খ্যাতনামা লেখক থেকে তরুণ ঔপন্যাসিক– সবার লেখাতেই তিনি চলচ্চিত্রে রূপায়নের উপযোগী গল্প খুঁজেছেন। সিগনেট প্রেসে কাজ করার সময় ১৯৪৫ সালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'র কিশোর সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু'র প্রচ্ছদ এবং অলংকরণ করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। ঐ সময়েই এই কাহিনীটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়ার চিন্তা মাথায় আসে তাঁর।সেখান থেকে শুরু। এরপর বাংলা সাহিত্য এবং বিশ্বসাহিত্যের অমর কিছু সৃষ্টিকে তিনি আপন ভঙ্গিতে বিনির্মাণ করেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু (পরশুরাম), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মনিশংকর মুখোপাধ্যায় (শংকর), মুন্সি প্রেম চান্দ এবং হেনরিক ইবসেনের মতো লেখকদের সাহিত্যকর্মের চিত্ররূপ দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন তিনি।

'বাংলাসাহিত্য' বললে অবধারিতভাবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম আসে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম–শতবর্ষকে কেন্দ্র করে তাঁর সৃষ্টি নিয়ে প্রথমবারের মতো কাজ করেন সত্যজিৎ রায়। রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোটগল্পকে বেছে নিয়ে তিনি নির্মাণ করেন 'তিন কন্যা'। 'পোস্টমাস্টার', 'মণিহারা' এবং 'সমাপ্তি'– গল্পগুলো ভিন্ন স্বাদের হলেও তিন গল্পের তিন নারী চরিত্র এদের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করেছে।
একই বছরে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর একটি তথ্যচিত্রও নির্মাণ করেন। নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজগতে বিশ্বজোড়া খ্যাতি থাকলেও তাঁর বৈচিত্র্যময় ছোটগল্প জগতের সাথে বৃহত্তর বৈশ্বিক দর্শকগোষ্ঠীর পরিচয় ঘটে এ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে।

এখন রবীন্দ্রনাথের তিন ছোটগল্পের সত্যজিৎ রায় প্রদত্ত চিত্ররূপে আসা যাক।শিল্প যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে রূপ নেয়, তখন রূপান্তরের মাঝে পূর্ণ সাদৃশ্য বজায় রাখার কোন নিয়মতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা থাকে না নির্মাতার। হুবহু অনুকরণে মৌলিকত্বের ছাপ যেমন অনুপস্থিত থাকে, একইসাথে শিল্পের গুণও আর তার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকে নির্মিত চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র গল্পের সাদৃশ্য খুঁজে বেড়ানোটা সমীচীন নয়। এই লেখায় গল্পের চিত্ররূপ দিতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় যেভাবে প্রতিটি গল্পকে স্বাধীনভাবে বিনির্মাণ করেছেন, সেটাই অনুভবের চেষ্টা করব।

'তিন কন্যা'র প্রথম ছবি 'পোস্টমাস্টার'। এই ছবির কিশোরী রতন 'তিন কন্যা'র প্রথম কন্যা। কলকাতার ছেলে নন্দলালকে পোস্টমাস্টার হিসেবে কাজের শুরুতেই আসতে হয় অজপাড়াগাঁ উলাপুরে। সেখানেই তার সাক্ষাৎ ঘটে রতনের সাথে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

'পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো–তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।"

সেই অনাথ কিশোরীকে বোনের মতো আপন করে নেয় পোস্টমাস্টার নন্দলাল। রতনকে সে লেখাপড়া শেখায়, অবসরে তাকে নিজের বাড়ির গল্পও শোনায়। আবার নন্দলাল ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হলে তাকে প্রাণপণে সেবা করে সুস্থ করে তোলে রতন। এই চলচ্চিত্রে রতন চরিত্রে চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পোস্টমাস্টারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়।

একটি অচেনা পরিবেশে পোস্টমাস্টার নন্দলালের সাথে রতনের যে পারস্পরিক নির্ভরতা এবং স্নেহের মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা আপন ভঙ্গিতে সুচারুভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সত্যজিৎ রায়। সঙ্গত কারণেই গল্পভাষাকে চিত্রভাষায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে চরিত্রসৃষ্টি এবং গল্পের বয়ানে পার্থক্য এনেছেন সত্যজিৎ রায়। গ্রামের কিছু বৃদ্ধ অধিবাসী এবং একজন পাগলকে গল্পের বাইরে তিনি আলাদাভাবে এই চলচ্চিত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে রতনের বয়স ছিল বারো-তেরো। সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্রে রতনের বয়স সাত-আটে আবদ্ধ রেখেছেন। ভাই-বোনের সম্পর্কের বাইরে তাদের মধ্যে অন্য কোন হৃদয়ঘটিত দুর্বলতা গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকে এর মধ্য দিয়ে রুদ্ধ হয়েছে। রতনের সাথে পোস্টমাস্টারের সম্পর্ক কি প্রভু- ভৃত্যে আবদ্ধ থাকবে, না কি ভ্রাতা-ভগ্নীর সম্পর্কে রূপান্তরিত হবে, এই দ্বন্দ্বটিতে বিশেষভাবে আলো পড়েছে এই চলচ্চিত্রে।

রতন একমনে লেখাপড়া শেখে এই উদ্দেশ্যে যে, লেখাপড়া জানলে পোস্টমাস্টারের কলকাতায় ফেলে আসা ছোটবোনের সাথে তার আর কোনো পার্থক্য থাকবে না। পোস্টমাস্টারও সেই আশার আলো আরও উজ্জ্বল করে তোলেন রতনকে নিয়ে একটি ছড়া লেখার মধ্যে,

'রতন আমার রতন তার কাজে বড়ই যতন সে আমার বোনের মতন'

অথচ অসুস্থ অবস্থায় জ্বরের ঘোরে রতনকে চিনতে না পেরে নন্দবাবু যখন জিজ্ঞেস করেন, *'তুই কে?'* সে আঘাত পেয়ে উত্তর দেয়, *'রতন, বাবু। তোমার কাজ করি।'* অর্থাৎ এ বন্ধন যে ভঙ্গুর, তা যেন রতন আগেই অনুভব করেছিল। উল্লেখ্য, এ দুটো দৃশ্যই সত্যজিৎ রায় নিজস্বভাবে তাঁর চলচ্চিত্রে সৃষ্টি করেছেন, রবীন্দ্রনাথের গল্পে এসবের কোনো উল্লেখ নেই।রতনকে ফেলে রেখে কলকাতার পথে রওয়ানা হয়ে নৌকায় বসে পোস্টমাস্টারের অনুভবের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন এভাবে,

'একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি'- কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে- এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।'

সত্যজিতের 'পোস্টমাস্টার'-এ রতনকে আমরা আরও শক্ত এবং বাস্তবমুখী একটি চরিত্ররূপে আবিষ্কার করি- যে ভেতরে ভেতরে ডুকরে কাঁদলেও আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় না। 'পৃথিবীতে কে কাহার'- এই অনুভবটি গল্পে ছিল পোস্টমাস্টারের। কিন্তু চলচ্চিত্রে এ অনুভবটি হয়েছে রতনের। তাই পোস্টমাস্টার চলে যাওয়ার সময় সে কিছুতেই তার কান্নাভরা চোখ দেখাতে চায় না এবং দূর থেকে তার কণ্ঠ শোনা যায়, *'নতুনবাবু, জল এনেছি।'* অর্থাৎ জগতে সম্পর্কের অনিত্যতার যে অনুভব রতনকে বারবার তাড়িত করেছে, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে চলচ্চিত্রের শেষে।

'তিনকন্যা'র দ্বিতীয় ছবি 'মণিহারা'। রবীন্দ্রনাথের একটি অতিপ্রাকৃত গল্পকে 'তিন কন্যা'র এই ছবিটি নির্মাণের জন্য বেছে নিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। জমিদার ফণীভূষণ সাহার নিঃসন্তান স্ত্রী মণিমালিকা গহনার প্রতি গভীরভাবে আসক্ত। সেই অতি আসক্তিই ধীরে ধীরে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝে দেয়াল তুলে দেয় এবং মণিমালিকা ক্রমেই তার স্বামীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এমনকি স্বামীর সঙ্কটে সে তাকে ফেলে তার বহুদিনের সঞ্চিত গয়নাগুলো নিয়ে পালিয়ে যেতে চায়। অতঃপর মণিমালিকাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না এবং স্বামী ফণীভূষণ তার জন্য অধীর হয়ে

অপেক্ষা করে। গহনার লোভে ফিরে আসা একটি কঙ্কাল-হাত চলচ্চিত্রের সমাপ্তিতে একটা ভৌতিক আবেশ সৃষ্টি করে।

এই ছবিতে মণিমালিকার ভূমিকায় কণিকা মজুমদার আর তার স্বামী জমিদার ফণীভূষণ সাহার ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন। অতিপ্রাকৃত গল্প হলেও নারী-হৃদয়ের রহস্যময় দিকটি এই চলচ্চিত্রে বিশেষভাবে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। 'তিনকন্যা'র এই ছবিটির ইংরেজি সাবটাইটেল যথাসময়ে তৈরি না হওয়ায় ইন্টারন্যাশনাল রিলিজে এটি বাদ পড়ে। একে এই ত্রয়ীর সবচেয়ে দুর্বল ছবি বললেও ভুল হবে না।

'তিন কন্যা'র তৃতীয় কন্যা 'সমাপ্তি' ছবির মৃন্ময়ী। চঞ্চলপ্রাণ কিশোরী মৃন্ময়ীর বিবাহের প্রথাবদ্ধ আচরণে মানিয়ে নিতে না পারার গল্পকে হাস্যরসাত্মকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এই চলচ্চিত্রে।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা রোমান্টিক গল্পগুলোর মাঝে একটি অনন্য সৃষ্টি 'সমাপ্তি'। চলচ্চিত্রে রূপান্তরের সময় গল্পটিকে নিজের মতো করে সাজিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। মৃন্ময়ীর গয়না গায়েই বাসর ঘর থেকে গাছ বেয়ে পালিয়ে যাওয়া, ছেলেমানুষীসুলভ চঞ্চলতা, কিংবা পোষা কাঠবিড়ালি চরকির সঙ্গে কথা বলার দৃশ্যগুলো কিশোরীর স্বতন্ত্র জগতকে নির্দেশ করে এবং সেই জগৎ আকস্মিকভাবে বাধাগ্রস্ত হয় বিবাহ নামক নিয়মতন্ত্রের জালে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পের শেষে কিশোরী মৃন্ময়ীকে সুচারু গৃহবধূতে রূপান্তর করেন, কিন্তু সত্যজিৎ রায় পুরো চলচ্চিত্রজুড়ে মৃন্ময়ীর চঞ্চল রূপটিকেই অক্ষুন্ন রেখেছেন। মৃন্ময়ী হয়ে উঠেছে গ্রামবাংলার কিশোরী বধূদের ছেলেমানুষীর আবহমান শাশ্বত বর্ণময় রূপ। এই চলচ্চিত্রে মৃন্ময়ীর স্বামী অমূল্যের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং মৃন্ময়ীর চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের পর্দায় অভিষেক ঘটে অপর্ণা সেনের (দাশগুপ্ত।

১৯৬১ সালে 'তিন কন্যা'র 'সমাপ্তি' ছবিটি রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক লাভ করে। পাশাপাশি মেলবোর্ন এবং বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবেও সম্মানিত হয় এই চলচ্চিত্রটি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিকে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই একটা চাপ থাকে। সত্যজিৎ রায় সাহসের সাথে কাজটি তো করেছেন বটেই, পাশাপাশি নিজের পরীক্ষণধর্মী মানসিকতা এবং স্বাতন্ত্র্যও পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছেন এই চলচ্চিত্রে। পরবর্তীতে তিনি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'নষ্টনীড়' অবলম্বনে 'চারুলতা'(১৯৬৪) এবং 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস অবলম্বনে১৯৮৪ সালে একই নামে আরো দুটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এই নির্মাণগুলোর প্রতিটিই আপন মহিমায় বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

সাহিত্যে আর সেলুলয়েডে সত্যজিতের নারীদের ব্যাপ্তিতে বিশাল ফারাক। সাহিত্যে যেখানে তিনি নারীত্বকে একরকম অস্বীকারই করে গেলেন, সেখানে তাঁরই হাত ধরে রুপালি পর্দায় উপস্থাপিত হলো নারীত্বের সত্যতম রূপ। ব্যক্তিজীবনে মা ও স্ত্রী, অর্থাৎ খুব কাছের দুই নারীকেই পেয়েছেন সংগ্রামী ও সাহসী সঙ্গিনী হিসেবে। তাই হয়তো একজন সত্যজিৎ বিনা দ্বিধায় বলতে পারেন, 'দৈহিক দিক দিয়ে পুরুষদের মতো শক্তিশালী না হলেও প্রকৃতি নারীদের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়েছে, যার মাধ্যমে তারা এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে। তারা অপেক্ষাকৃত বেশি সৎ, অকপট এবং অনেক দিক দিয়েই বেশি শক্তিশালী।'

সৃজন সঙ্গী:

অভি দাস (স্নাতক, সেমেস্টার ৫)
ঊর্মি চৌধুরী (স্নাতক, সেমেস্টার ৩)
কৌস্তভ ঘোষ (স্নাতকোত্তর, সেমেস্টার ৩)
দিশা দাস (স্নাতক, সেমেস্টার ৩)
দীপা পাল (প্রাক্তনী)
নাফিসা খাতুন (প্রাক্তন)
পারমিতা সাহা (স্নাতকোত্তর, সেমেস্টার ৩)
প্রণয় সর্বজ্ঞ (প্রাক্তনী)
প্রিয়া মজুমদার (স্নাতকোত্তর, সেমেস্টার ১)
বাকিবুল্লা মন্ডল (স্নাতক, সেমেস্টার ৩)
মৌ ঘোষ (স্নাতক, সেমেস্টার ৩)
মৌমি সাহা (স্নাতক, সেমেস্টার ৩)
রমেন পাত্র (স্নাতকোত্তর, সেমেস্টার ১)
শুভজিৎ দাস (স্নাতকোত্তর, সেমেস্টার ৩)
সমতা ভৌমিক (স্নাতক, সেমেস্টার ৫)
সুমাইয়া পারভিন (স্নাতক, সেমেস্টার ৩)
সুস্মিতা দাস (স্নাতক, সেমেস্টার ৫)
সুশান্ত পাত্র (প্রাক্তনী)
সাগরিকা রায় (লেখিকা)

পত্রিকা কমিটি ২০২১

সম্পাদক

অভি দাস ও সমতা ভৌমিক

কার্যকরী কমিটি

মৌ ঘোষ, মনিদীপা কর্মকার, কৌস্তভ কুমার ঘোষ, মৌমি সাহা, সৌমিলি দাস, সুস্মিতা দাস, অনন্যা দেঁড়ে (মালাকার), নাফিসা খাতুন, নূরনেহার বেগম, শুভজিৎ দাস, সুশান্ত পাত্র।

মুখ্য উপদেষ্টা

অধ্যক্ষ, বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়।
বিভাগীয় প্রধান বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়।
বাংলা বিভাগের সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা ।